# সোনালী-দুঃখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

# সোনালী দুঃখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লাইম বুকস্
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সোনালী দুঃখ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ এ্যানি

প্রথম লাইম বুকস্ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি '৯৯

মুদ্রণ ঃ দে'জ অফসেট, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী সুবীন দাস

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

## ।। এক ।।

আমি একজন সামান্য কবি। হে প্রভুগণ, আপনারা গুণী মানি লোক, আপনারা কত পড়েছেন, কত শুনেছেন, রসের বিচার করতে জানেন। আমি আপনাদের সভায় এসেছি, যদি অনুমতি পাই, আপনাদের আজ দুজন নারী-পুরুষের ভালোবাসার গান শোনাবো। ভালোবাসার জন্যই মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, কিন্তু এই যে দুজন— এদের মতো এমন তীব্র-মধুর ভাবে আর কেউ বোধ হয় কখনও ভালোবাসেনি। আপনারা মহৎ, আপনারা উদার, আপনারা জানেন ভালোবাসা হচ্ছে আগুনের মতো, যাতে কোনো পাপ স্পর্শ করে না। আপনারা অন্তর দিয়ে বুঝতে পারবেন, এই দুই হতভাগ্য প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের শক্তিতে কি করে পাপ-পুন্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল! আহা, ওদের গান শুনলে যে মানুষ পাহাড়ের মতো কঠোর ব্রহ্মচারী তারও বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে ঝরনা। অপ্রেমিকও প্রেমিক হয়। সুখভোগ আমোদ-আহলাদে ডুবে আছে যে মানুষ, এই গান শুনে সেও এক মুহূর্ত থমকে যায়, তার মনে পড়ে—জীবনে কি যেন বাকি রয়ে গেল, বুকের মধ্যটা উদাস উদাস হয়ে যায়। এই গান শোনার পর, যখন আপনারা কেউ একা থাকবেন আপনাদের মনে হবে—এই পৃথিবীতে যে জন্মালুম, জীবনটা ঠিক মত বাঁচা হলো তো? নাকি এক জীবন মনের ভুলেই কেটে গেল! ভালোবাসাহীন জীবনই তো ভুল জীবন! আমি এই গান-গ্রামে গ্রামে, হাটে-বাজারে নদীর ধারে গেয়ে বেড়াই। আজ আপনাদের সভায় এসেছি অনুমতি করুন।

রাজকুমারের নাম দুঃখ, রাজকন্যার নাম সোনালী। কোথায়, কত দূরে ওরা ছিল, তবু দেখা হয়ে গেল। পৃথিবীতে এদের চেয়ে সুন্দর, এদের চেয়ে নিস্পাপ নারী-পুরুষ কি আর জন্মেছে? ওদের মতো সুখী কেউ নেই, ওদের মতো দুঃখীও কেউ নেই। ভালবাসা মানেই তো দুঃখ, তবু মানুষ ভালবাসতে চায়। জীবনে ভালোবাসাই একমাত্র দুঃখ, যেখানে মানুষ ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ওরা বড় বেশী দুঃখ পেয়েছে ভালোবেসে। অমন সোনার মতন শরীর, তবু বনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন পোশাকে রোদ বৃষ্টির নিচে দু'জনে দুজনকে আলিঙ্গন করে যখন ঘুমিয়েছে— সে দৃশ্য ভাবলে বুক ফেটে যায়। প্রভু, আমাকে এক মিনিট ক্ষমা করুন। ওদের কথা বলার আগে আমি একটু চুপ করে বসে থাকি। ওদের কথা বলতে গেলেই আমার গলার কাছে কান্না ঠেলে আসে। প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে যায়। ওঃ! ওরা এক সঙ্গে পান করেছিল ভালোবাসা ও মৃত্যু। ওদের কাছে মৃত্যু আর ভালোবাসা এক।

যেদিন ওরা ঠোটের কাছে তুলে এনেছিস সেই ভয়ঙ্কর সুরার পাত্র, সেদিন যদি ওরা জানতো যে ওদের ভালোবাসা ওদের মৃত্যু পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে—তাহলে কি ওরা ভয় পেত? ঠোটের কাছে এনেও সরিয়ে দিত? কি জানি! ভালোবাসায় মানুষ বরাবর একই ভুল

করে। প্রেমিকরা কখনও অভিজ্ঞ হয় না। অভিজ্ঞ লোকেরা প্রেমিক হতে পারে না। রাজকন্যাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে তবু কেন রাজকুমার ফিরে আসতে লাগলো বারবার?

কিন্তু তার আগে বলি রাজকুমারের জন্মবৃত্তান্ত। ওর দুঃখিনী মায়ের কথা, যে মা নিজের সন্তানের নাম রেখেছিল, দুঃখ।

সে অনেক, অনেক দিনের আগের কথা। অনেক দূর দেশের কথা। রূপকথা নয়, আপনার-আমার জীবনের মতনই সত্যি ঘটনা। হিমালয় পেরুলে তাতার বেদুইনদের দেশ, তারপর মরুভূমি। মরুভূমিও পার হলে নীল ভূমধ্যসাগর। ভূমধ্যসাগরের ওপারে স্থলভাগকে বলে ইউরোপ। সেখানকার সব মানুষই ফর্সা। আমাদের থেকে অন্যরকম চেহারা। কিন্তু চেহারা অন্যরকম হলে কি হয়, মানুষের স্বভাব পৃথিবীর সব দেশেই একরকম। হুজুর, যুবক-যুবতীর ভালোবাসা, মায়ের কান্না, আর শত্রুর ক্রোধ—এ সব দেশেই এক। ঐ ইউরোপের একটা ছোট্ট রাজ্যের নাম কর্নওয়াল। সেখানকার রাজার নাম মার্ক। ভারী ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ রাজা, প্রজারা সকলেই তাঁকে ভালোবাসে। তাঁর রাজ্যে কোন অভাব নেই, অশান্তি নেই। যুদ্ধ করার বদলে রাজা বেশী ভালোবাসেন গান বাজনা। হঠাৎ একদিন ওঁর রাজ্য আক্রমণ করলো বাইরের এক দস্যু-রাজা। সীমান্ত পেরিয়ে শত্রু-সৈন্য গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিতে লাগল। রাজা মার্ক প্রাণপণে লড়াই করতে লাগলেন নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য—কিন্তু দুর্দান্ত বেপোরোয়া নিষ্ঠুর দস্যুদের সঙ্গে সহজে এঁটে উঠলেন না। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চলতে লাগলো।

রাজা মার্কের দেশের একদিকে সমুদ্র। সেই সমুদ্রের ওপারে যে রাজ্য, তার নাম লিওনেস। সেই লিওনেসের রাজা রিভালেন রাজা মার্কের খুব বন্ধু। তিনি বন্ধুর বিপদের কথা শুনেই নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে ছুটে এলেন সাহায্য করতে। রাজা মার্কের সঙ্গে যদিও রিভালেনের বন্ধুত্ব, কিন্তু দুজনের চরিত্র সম্পূর্ণ দু'রকম। রিভালেনের দীর্ঘ, সুঠাম চেহারা—দুঃসাহসী স্বভাব, যুদ্ধ করাই তার একমাত্র শখ। রাজা মার্ককে তিনি বললেন, তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো, আমি যুদ্ধটা সেরে আসি। তারপরই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে কি অতুলনীয় বিক্রম রিভালেনের, তাঁর নির্ভীক মুখ, স্বচ্ছন্দ গতি আর ঐ রকম সুন্দর চেহারা দেখে মনে হয়, যেন স্বয়ং দেবসেনাপতি যুদ্ধে নেমেছেন। এ যুদ্ধ জয় করতে তার বেশিদিন লাগলো না। দস্যুর দলকে তিনি সীমান্ত পার করে দিয়ে এলেন।

রাজা মার্কের দেশের লোক রাজা রিভালেনকেও হৃদয়ে আসন দিল। সারা রাজ্যে শুরু হলো উৎসব। সকলেরই মুখে রিভালেনের নাম। এমন সুপুরুষ, এতবড় বীর কেউ কখনো দেখেনি। নিজের বন্ধুদের জন্য কে এতখানি করে?

রাজা মার্কের চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। তিনি রিভালেনের হাত চেপে ধরে বললেন, বন্ধু তুমি যা করেছো আমার জন্য, জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়ের জন্যও লোকে আজকাল তা করে না। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

রাজা রিভালেন যুদ্ধে যেমন পারঙ্গম, কথাবার্তায় তেমন নয়। তিনি লাজুক হেসে বললেন, তুমি একটু বাড়িয়ে বলছো। বন্ধুকে তো বন্ধু সাহায্য করবেই!

মার্ক বললেন, বিপদের সময়েই কে আসল বন্ধু তা চেনা যায়। আমার বিপদের দিনেই জানতে পারলুম, বন্ধু হিসেবে তুমি কত মহৎ।

রিভালেন বললেন, আমি কি শুধুই তোমার জন্য যুদ্ধ করেছি? বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করা প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যদি তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি এগিয়ে না আসতুম,

তবে ক্ষত্রিয় হিসেবে নিজের কাছে আমার সম্মান কোথায় থাকতো? তোমাকে বাঁচাতে এসে সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের আত্মসম্মান আর অহঙ্কারকেও বাঁচিয়েছি।

রাজা মার্ক বললেন, এ শুধু বীরেরই যোগ্য কথা। কিন্তু তোমাকে এখন আমি ছাড়ছি না। তোমাকে আমি এমন বাধনে বাধতে চাই যেখান থেকে মুক্তি পাবার সাধ্য তোমার মতো বীরেরও নেই ।

—সে কোন্ বাধন, বন্ধু? জিগ্যেস করলেন রিভালেন।

—সুন্দরীর ভুজবন্ধন! তুমি আমার বোন শ্বেতপুষ্পাকে বিয়ে কর। তাকে একবার দেখো, সে তোমার অযোগ্য হবে না।

হঠাৎ লজ্জায় মাথা নিচু করলেন তরুণ রাজা রিভালেন। শ্বেতপুষ্পাকে বুঝি তিনি আগেই দেখেছিলেন। যুদ্ধযাত্রার দিন সকালে রাজপ্রাসাদের জানালায় দাঁড়ানো রাজকুমারীকে তিনি দেখেছিলেন এক পলক। রাজকুমারী শ্বেতপুষ্পাও বুঝি তার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। তখনই রিভালেনের বুকের রক্ত চমকে উঠেছিল। এমন সুন্দরও কেউ হয় পৃথিবীতে? শ্বেতপুষ্পা সত্যিই যেন একটা সাদা ফুল, কিন্তু কি ফুল তার নাম জানেন না রাজা, আগে কখনো এ ফুল দেখেননি। কি জানি, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্বেতপুষ্পার মুখ মনে করেই রাজার শরীরে অতখানি বীরত্ব ও তেজ এসেছিল কিনা!

শুভ তিথিতে রাজার সঙ্গে বিয়ে হলো শ্বেতপুষ্পার। টিন্টাজেল দুর্গে সে বিবাহের সমারোহের বর্ণনা দেবো এমন শক্তি আমার নেই। প্রভু, আমি তো আর বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলুম না। তবে কল্পনা করতে পারি, তরুণ রাজা রিভালেনের পাশে শ্বেতপুষ্পাকে মানিয়েছিল ঠিক স্বর্গের দেব-দেবীর মতো।

সমস্ত কর্নওয়াল রাজ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। যুদ্ধে জেতার আনন্দ, সেই সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে। টিন্টাজেল দুর্গের সোনারপালঙ্কে শুয়ে রিভালেন নব-পরিণীতার সঙ্গে ডুবে রইলেন এক মধুর স্বপ্নে। রণক্লান্ত যোদ্ধা এখন বিশ্রাম করছেন।

কিন্তু আপনারা সবাই জানেন, বিশ্বসংসারে সুখ বড় চঞ্চল। কোনো নারীর অঞ্চলেই সুখ দীর্ঘকাল বাঁধা থাকে না। হঠাৎ দুঃসংবাদ এলো রিভালেনের রাজ্য আক্রমণ করেছে পরম পরাক্রান্ত জমিদার, ডিউক মর্গান। রাজার অনুপস্থিতির সুযোগে, অর্ধেক রাজত্ব সে জয় করে নিয়েছে।

একথা শুনেই জেগে উঠলেন সুপ্ত সিংহ। রিভালেন তখনই জাহাজ সাজিয়ে যাত্রা করলেন নিজের দেশের দিকে। সঙ্গে নিয়ে চললেন নতুন রানী শ্বেতপুষ্পাকে। উপকূলের কাছেই তার যে দুর্গ, সেখানে এসে উঠলেন প্রথমে। তারপর ডাকলেন তাঁর বিশ্বাসী অনুচর রোহল্টকে। রোহল্টের সততা এবং প্রভুভক্তি এমন বিখ্যাত ছিল যে সকলেই তাকে ডাকতো, সত্যবাহন রোহল্ট। রাজা রোহল্টকে বললেন, রোহল্ট, তোমাকে আমি রেখে গেলাম রানীকে পাহারা দিতে। রানী শ্বেতপুষ্পা নিজের দেশ ছেড়ে এসেছেন নতুন দেশে, তুমি কখনো এঁর পাশ ছেড়ে যাবে না। আমি শয়তানটাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ফিরে আসছি।

রাজা তারপর রানী শ্বেতপুষ্পার কপালে চুম্বন দিয়ে বললেন, আমার ভিনদেশী ফুল, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো এখানে, কোনো ভয় নেই তোমার, আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ ছোঁচা মার্গানটাকে বন্দী করে নিয়ে আসছি তোমার পায়ের কাছে। মাত্র এক সপ্তাহ, তুমি একটু কষ্ট করে একা থাকো!

যাবার সময় রাজা জেনে গেলেন না যে রানী তখন গর্ভবতী।

তারপর একদিন যায়, দুদিন যায়, রাজার আর কোনো খবর নেই। সাতদিনও কেটে গেল। রাজা এলেন না। রানী শ্বেতপুষ্পা সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন জানালায়। রানী খান না, ঘুমোতে যান না। রানী ঠায় দাঁড়িয়ে জানালায়। শেষকালে একদিন ভগ্নদূতের মুখে খবর এলো, রাজা রিভালেন মারা গেছেন গুপ্তঘাতকের ছুরিতে, তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বাকি সৈন্যরা সবাই জড়ো হয়ে শুধু রক্ষা করছে এই উপকূলের দুর্গ।

রিভালেনের মৃত্যুর খবর শুনে দুর্গে কান্নার রোল পড়ে গেল। কাঁদলেন না শুধু রানী। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে খবরটা শুনলেন। তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে এতদিন পর এই প্রথম স্নান করে একটু জল মুখে দিয়ে শুতে গেলেন। তার পরদিনও রানীর চোখ শুকনো, কোনো কান্না নেই। কেউ কেউ আড়ালে বললো, উঃ, রানী কি নিষ্ঠুর! একফোটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললেন না, স্বামীর মরণের খবর শুনে একটু হা-হুতাশ নেই! অন্তত লোক দেখানোও তো খানিকটা করতে হয়!

একমাত্র সত্যবাহন রোহল্ট আসল ব্যাপাটা বুঝতে পেরেছিলেন। নিভৃতে এসে রানীর পায়ের কাছে বসে বললেন রোহল্ট, মা, একি মরণপণ তোমার? এক ফোটা চোখের জল ফেলো, তাই দেখে আমরা বাঁচি।। কেন তুমি নিজেকেও মারতে চাইছো? দুঃখের বোঝা বাড়াবার চেয়ে হালকা করার চেষ্টা করাইতো উচিত সবার। যে জন্মায় তাকে তো একদিন মরতেই হবে। বরং কারুর মরার খবর শুনলে, যে বেঁচে আছে তার বেশি করে বাচার চেষ্টা করা দরকার।

রানী শ্বেতপুষ্পা ম্লান হেসে বললেন, তোমার ভয় নেই, তোমার ভয় নেই রোহল্ট, আমি এত সহজে মরবো না।

রানীর মুখ এমন পাষাণের মতো শান্ত যে দেখলে বুক কেঁপে ওঠে।

কিছুদিনের মধ্যেই শ্বেতপুষ্পা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। সেই পুত্রকে দুহাতে তুলে ধরে রানী বললেন, বাছা, তোর প্রতীক্ষাতে আমি বেঁচে ছিলাম, আজ তোর দেখা পেলাম। তোর মতো এমন সুন্দর সন্তান বুঝি পৃথিবীতে আর কোন নারী জন্ম দেয়নি। কিন্তু বড় দুঃখের দিনে তুই এসেছিস। বড় দুঃখের মধ্যে আসিস এসেছি এ দেশে। বড় দুঃখে আমার কেটেছে এ-কটা দিন। ওরে, বড় দুঃখের মুহূর্তে তোর জন্ম। আরও কত দুঃখ তোর সামনে আছে কি জানি! এত দুঃখ তুই ললাটে নিয়ে এসেছিস, তাই তোর নাম রাখলাম আমি 'ত্রিস্তান', অর্থাৎ দুঃখের সন্তান। দুঃখের সন্তান, তুই আর এক দুঃখ।

এই কথা বলে রানী শিশুর কপালে চুম্বন করে রোহল্টের হাতে তুলে দিলেন। বললেন, রোহল্ট, তুমি এই শিশুকে রক্ষা করো। তোমার প্রভুকে তুমি ভালোবাসতে। সেইরকম ভালোবাসা দিয়েই এই শিশুকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো। নাও! তার সঙ্গে সঙ্গেই রানী লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। রোহল্ট রানীকে তুলতে গিয়ে দেখলো রানীর দেহে প্রাণ নেই। শিশুকে রোহল্টের হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রানী প্রাণত্যাগ করেছেন। শুধু এই মুহূর্তটির জন্যই বেঁচে ছিলেন।

কিন্তু তখন শোক করারও সময় নেই। দুর্গের বাইরে শত্রু। এতদিন প্রতিরোধ করে রাখার পরও দুর্গকে আর রক্ষা করা গেল না। শত্রুসেনা দুর্গের প্রাচীর ডিঙিয়ে ঢুকতে শুরু করেছে। রোহল্ট সাদা পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। স্বীকার করে নিলেন ডিউক মর্গানের অধীনতা। কিন্তু মর্গান কি এই শিশুটিকে বাচঁতে দেবে? শত্রুর শেষ কেউ রাখে

না। রোহল্ট তখন সেই শিশুকে রেখে এলেন নিজের স্ত্রীর কাছে, চারিদিকে রটিয়ে দিলেন তার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

ক্রমে সাত বছর বয়েস হলো শিশুর। রোহল্ট তখন তার জন্য একটি আলাদা গুরু ঠিক করলেন? সেই গুরু হলেন সর্ববিদ্যা পারঙ্গম গরভেনাল। গরভেনাল অবাক হয়ে গেলেন বালক ত্রিস্তানকে দেখে। এই বালকের যে সর্বশরীরে রাজলক্ষণ, অথচ এ রোহল্টের পুত্র! হুজুর, আপনারা জানেন, সিংহের শাবক সিংহই হয়। কোকিলের ছানা কাকের বাসায় বেড়ে উঠে কিন্তু তা বলে সে কাক হয়ে যায় না, বড় হয়ে কোকিলই হয়। ঝরনার পাশ থেকে তুলে এনে গোলাপের চারা ছাইগাদায় পুতলে তাতে গোলাপ ফুলই ফুটবে। ত্রিস্তানের স্বভাবে ফুটে উঠতে লাগল রাজকীয় সমস্ত গুণ। বর্শাচালনা, তলোয়ার খেলা, ধনুক বাণ ছোড়া, ঘোড়ায় চড়ে লাফিয়ে নদী পার হওয়া—এসব সে শিখে নিল অতি সহজেই। সেই সঙ্গে গুরু গরভেনাল তাকে আরও শেখালেন পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যা ও নীচতাকে ঘৃণা করা এবং প্রাণ দিয়েও শপথ রক্ষা করা। শুধু যুদ্ধ নয়, ত্রিস্তান আরও শিখলো— বেহালা বাজানো, গান ছবি,

আঁকা। পনেরো বছরের কিশোর ত্রিস্তান যখন সাদা ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে যেত, তখন পথচারীরা থেমে দাঁড়িয়ে দেখতো তার যাওয়া, বলাবলি করতো কি ভাগ্য রোহল্টের এমন সন্তানের পিতা হয়েছে! এরকম সুঠাম, সুকুমার সর্বগুণের আধার এই সন্তানের নাম সে 'দুঃখ' রেখেছে কেন? সত্যবাহন রোহল্ট কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য পরলোকগত প্রভু রিভালেন এবং রানী শ্বেতপুষ্পার কথা ভোলেননি। ত্রিস্তানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়তো তার। ত্রিস্তানকে তিনি বাইরে নিজের পুত্রের মতো স্নেহ করলেও মনে মনে ভক্তি করতেন প্রভুপুত্র হিসেবে।

হঠাৎ একদিন রোহল্ট চোখে সর্বনাশ দেখলেন। ত্রিস্তান নেই। ত্রিস্তান চুরি হয়ে গেল। নরওয়ে থেকে একটি বাণিজ্য–জাহাজ এসেছিল। ত্রিস্তান সমুদ্রের পাড়ে একা একা দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়েছিল সেই জাহাজের দিকে। এই জাহাজ কত দেশ ঘুরে ঘুরে এসেছে! দেখেছে কত জনপদ্ কত রকম মানুষ! ত্রিস্তানের ইচ্ছে হয়, সেও একদিন এরকম একটা জাহাজে চড়ে দূরেদেশে চলে যাবে। সমুদ্রের যেখানে শেষ হয়ে গেছে, তার ওপারে কোন্ দেশ আছে সে গিয়ে দেখবে। জাহাজের নাবিকেরা এসে ত্রিস্তানের সঙ্গে ভাব করে। ত্রিস্তানকে দেখে লোভে তাদের চোখ চক্চক্ করে ওঠে। এমন সুন্দর সুঠাম কিশোরকে যদি তারা ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করতে পারে, কত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় তাহলে! তারা ত্রিস্তানকে বললো, এসো না, আমাদের জাহাজের ওপরে উঠবে? উঠে ঘুরে ঘুরে গোটা জাহাজটা দেখে যাও না। ত্রিস্তানকে কথায় কথায় ভুলিয়ে একবার সেই জাহাজে তুলেই জাহাজ ছেড়ে দিল। অনেকক্ষণ ত্রিস্তান বুঝতে পারেনি, যখন সে বুঝতে পারলো— তখনই সে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো লড়াই করে চেষ্টা করলো সমুদ্রে লাফিয়ে পড়বার। কিন্তু অতজনের সঙ্গে সে একা পারবে কেন বলুন? তাছাড়া তার সঙ্গে কোন অস্ত্র ছিল না। ত্রিস্তান ওদের হাতে বন্দী হয়ে রইলো।

কিন্তু আপনারা জানেন, সমুদ্র কখনো পাপের বোঝা হয় না। ওরকম পাপের জাহাজ নিরাপদে যেতেই পারে না। আকাশ কালো করে ঝড় উঠলো, বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় দিক হারিয়ে সে জাহাজ কোন্ দিকে ভেসে চললো কে জানে! ক্রমাগত আটদিন ঝড়। তারপর জাহাজের নাবিকেরা ঝড় ও কুয়াশার মধ্যেই দেখতে পেল, সামনেই খাড়া একটা পাহাড়, জাহাজ সেদিকেই তীরবেগে এগিয়ে চলেছে। সেখানে ধাক্কা দিলেই জাহাজশুদ্ধ

সকলের মৃত্যু। দুঃখে অনুতাপে তারা তখনই হাঁটু গেড়ে বসে সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হে সমুদ্র আমরা এরকম পাপ কখনো করবো না। এই নিরাপরাধ কিশোরকে আমরা এক্ষুণি মুক্তি দিচ্ছি। এ কথা বলেই তারা একটা ছোট্টো নৌকো নামিয়ে কিছু খাবার দাবার দিয়ে ত্রিস্তানকে সেখানে ভাসিয়ে দিল। সেই সঙ্গে খুলে দিল হাত পায়ের বাধন। কি জানি সমুদ্র ওদের প্রার্থনা শুনছিল কিনা। কিন্তু হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি কমে গিয়ে কুয়াশা কেটে গেল। আস্তে আস্তে ভেসে চললো, ত্রিস্তানের নৌকা। ঠেকলো এসে সমুদ্রের পাড়ে।

সামনেই খাড়া পাহাড় আর কোন পথ নেই। অতি কষ্টে, প্রাণ হাতে নিয়ে ত্রিস্তান বেয়ে উঠলো খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর। উঠে দেখলো সামনে এক বিস্তৃত বনভূমি, নিচে সমুদ্র কোথাও কিছু নেই। তখন ত্রিস্তানের একবার তার বাবা গুরু গরভেনাল, আরও সকলের কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো তার দেশ লিওনেসের কথা। আর এখন সে কোথায় এসে পড়লো? দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো সে হঠাৎ। জনশূন্য সমুদ্রতীরে একা বালক বসে বসে কাঁদতে লাগলো। আপনারা ভেবে দেখুন সেই অসহায় দৃশ্য।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দূরে মানুষের শব্দ পেয়ে ত্রিস্তান চোখ মুছলো। কয়েকজন অশ্বারোহী একটা হরিণকে তারা করে আসছে। বাণবিদ্ধ হরিণটা এসে লুটিয়ে পড়লো ত্রিস্তানের কাছেই। অশ্বারোহীরা নেমে এল। ত্রিস্তান একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছে— শিকারীরা ওকে দেখতেই পায়নি। ওদের মধ্যে একজন তলোয়ার খুলে এক কোপে হরিণটার মাথা কেটে ফেলতে গেল। তাই দেখে ত্রিস্তান চেচিয়ে উঠলো, ওকি, অমন সুন্দর হরিণের চামড়াটা নষ্ট করছেন?

অশ্বারোহী চমকে ওঠলো। তারা এসে জিজ্ঞাস করলো, তুমি কে? কি তোমার নাম?

ত্রিস্তান জবাব দিল, আমার নাম ত্রিস্তান, লোকে আমাকে দুঃখ বলেও ডাকে। আমি বলেছিলুম, আপনারা হরিণটাকে গলা কেটে ফেলছিলেন, এতে যে চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

তুমি অন্য রকমভাবে চামড়া ছাড়াতে জানো নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ । যদি অনুমতি করেন, আমিই চামড়া ছাড়িয়ে দিতে পারি।

একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে নিপুন হাতে হরিণটাকে চিরতে লাগলো। একটু পরেই মনে হলো, ওখানে যেন দুটো ছালহীন মাংসময় হরিণ। তারপর ত্রিস্তান হরিণের মাংসগুলোও পৃথকভাবে কাটতে লাগলো।

অশ্বারোহীরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোন্ দেশ থেকে এসেছ? তোমার বাবা কে? এরকম চমৎকার ভাবে হরিণ ছাড়াতে তো এ দেশের কেউ জানে না। ত্রিস্তার এখন বুঝেছে, সব জায়গায় সব কথা বলা উচিত নয়। সে বললো, আমার দেশের নাম লিওনেস, আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী। আমি বাবার সঙ্গে জাহাজে করে ভারতবর্ষের পথে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমাদের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে। জাহাজ ভেঙে ভাসতে ভাসতে আমি এসেছি এখানে। জানি না, অন্য আর কেউ বেচেঁ আছে কিনা।

অশ্বারোহীরা দুর্ঘটনার কথা শুনে দুঃখিত হলেন। ত্রিস্তানের মধুর ব্যবহার দেখে বললো, বাঃ! লিওনেসের ব্যবসায়ীর ছেলেরাও এমন অভিজাতের মতো হয়? তুমি আমাদের রাজার কাছে যাবে? আমাদের রাজা মার্ক তোমাকে দেখলে খুব খুশী হবেন। তুমি তার কাছে আশ্রয় পেতে পারো।

ত্রিস্তান রাজা মার্ক সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সে আগ্রহের সঙ্গেই রাজার কাছে যেতে চাইলো। অশ্বারোহীরা ওকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললো।

বন পেরিয়ে জনপথ। দূরে থেকে দেখা যায় বিশাল দুর্গ টিন্টাজেল। সেই দুর্গের দেওয়াল বেয়ে উঠেছে আঙুরলতা। সাদা আর নীল পাথরের চৌকো চৌকো দেওয়াল, দূর থেকে দেখায় পাশা খেলার ছকের মতো। লোকে বলে পুরাকালের দৈত্যরা এই দুর্গ বানিয়েছে— নইলে মানুষের কি সাধ্য, এতবড় দুর্গ বানানো। টিন্টাজেল দুর্গ দেখে ত্রিস্তান অভিভূত হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলো, আমি কি এই দুর্গের মধ্যে কোনদিন ঢুকতে পারবো? তখনও সে জানে না, এই দুর্গের মধ্যেই তার ভাগ্য তাকে নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলা খেলবে।

রাজা মার্ক বন্ধু-সামন্তদের সঙ্গে বসেছিলেন, অশ্বারোহীরা ত্রিস্তানকে তার সামনে নিয়ে এলো। তারপর সবিস্তার বলতে লাগলো কি করে ত্রিস্তানকে ওরা আবিষ্কার করেছে। রাজা ত্রিস্তানকে দেখেই চমকে উঠলেন, এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। রাজা মার্ক ত্রিস্তানের জন্মকথা কিছুই জানেন না। তিনি জানেন তার বোন শ্বেতপুষ্পা আর তার বন্ধু রিভালেন মারা গেছেন নিঃসন্তান অবস্থায়। তবু ত্রিস্তানকে দেখে তার মনে হতে লাগলো এ মুখ বহু দিনের চেনা। ওকে দেখেই মনের মধ্যে কেমন মায়া আর ভালোবাসা জেগে উঠলো। রাজা মার্ক ওর দিকে তাকিয়ে তন্ন তন্ন করে ভাবতে লাগলেন, কেন এই মুখ দেখেই তার হৃদয় দুলে উঠলো! কিছুই ভেবে পেলেন না। কিন্তু আপনারা জানেন, রক্ত রক্তকে চেনে। রাজার রক্ত ত্রিস্তানের রক্তকে চিনেছিল। রাজা ত্রিস্তানকে ডেকে নিয়ে পাশে বসালেন। বললেন, তুমি এখানেই থাকো।

সেই দিন সন্ধেবেলা গান বাজনার মজলিস। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ গায়ক বীণা বাজিয়ে গান ধরেছেন। ত্রিস্তান রাজার পাশে বসে। গান চলেছে, এক প্রণয়ী যুগলের ব্যর্থপ্রেমের করুণ গান, হঠাৎ ত্রিস্তান গায়ককে বলে উঠলো, গুণী এই গানটা এত মধুর, তার চেয়েও মধুর আপনার গলা, কিন্তু মাঝের একটু অংশ বাদ দিলেন কেন? সে অংশটা যে সবচেয়ে সুন্দর!

গায়ক নিজের গান শেষ করে বললেন, আমি মাঝের অংশটা জানি না। তুমি জানো নাকি? লিওনেসের ব্যবসায়ীরাও কি তাদের ছেলেদের এ সব উচ্চাঙ্গের গান শেখায়? তুমি সেই অংশটা গেয়ে দেখাতে পারবে?

ত্রিস্তান বিনীতভাবে বীণা যন্ত্রটা তুলে নিয়ে গান ধরলো। সেই সুরের মূর্ছনা বাতাসের স্তরে স্তরে ঘুরতে লাগলো। যেন বাতাসই হয়ে গেল সুর। সেই ভাষায় সুর ছাড়া আর কিছু নেই। পুরুষের কৈশোরের কণ্ঠস্বর নারীর চেয়েও অনেক মিষ্টি অনেক সুরেলা হয়। ত্রিস্তানের সেই মিষ্টি রিণরিণে গলার সুরে সভাগৃহ যেন কাঁপতে লাগলো।

গান যখন শেষ হলো, তারও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সভাস্থল নিস্তব্ধ। রাজা উঠে এসে ত্রিস্তানকে আলিঙ্গন করে বললেন, ধন্য সেই গুরু যে তোমাকে গান শিখিয়েছে। তোমাকে দেখা মাত্রই আমার মনে আনন্দ হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। কেন জানি না বৎস, তোমার গান আমাকে অনেক দুঃখ ভুলিয়ে দিল। এ রকম শুদ্ধ সঙ্গীত মানুষের মনও শুদ্ধ করে। ত্রিস্তান তুমি আমার কাছে থাকো তুমি আর কোথাও যেও না। আমার হৃদয় বারবার তোমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

অভিভূত হয়ে ত্রিস্তান বললো, মহারাজ যদি দয়া করেন, আমি থাকবো। আপনার ভৃত্য হয়ে। আমি হব আপনার শিকারের সঙ্গী, আপনার বীণাবাদক।

সেখানেই থেকে গেল ত্রিস্তান। তিন বছর কেটে গেল। রাজা মার্কের কোনো ছেলে ছিল না। ত্রিস্তানের প্রতি এত টান জন্মালো যে এক মুহূর্তের জন্য তিনি ওকে কাছ ছাড়া করলেন না। রাজকার্যের সময়ও তিনি ত্রিস্তানকে ডাকেন পরামর্শ দিতে। রাজার মন খারাপ

হলে ত্রিস্তান বীণা বাজিয়ে শোনায়, রাত্রে রাজা যখন শুতে যান, ত্রিস্তান শুয়ে থাকে তাঁর পাশের ঘরে। দেশের সব লোকও ভালোবাসে ত্রিস্তানকে।

প্রভুগণ আপনারা জানেন, সৎকবি কখনো কাব্য গাথা অনাবশ্যক দীর্ঘ করে না। বাজে কবিরাই কাহিনীকে অকারণে ফেনিয়ে তোলে। রাজা মার্ক ত্রিস্তানকে কত রকম ভাবে স্নেহ দেখাতেন সে কথার আর বর্ণনা করে লাভ নেই। আমাদের মূল বিষয় ত্রিস্তানের বুক-পুড়ানো ভালোবাসা। সে কথায় আমরা এখনো আসিনি। তার আগে তার পূর্বকথা সংক্ষেপে সেরে নিতে চাই।

প্রভুভক্ত সত্যবাহন রোহল্ট ত্রিস্তানকে হারিয়ে এক মুহূর্ত শান্তিতে ছিলেন না। তিনি নিজেই ছদ্মবেশে ত্রিস্তানকে খুজতে বেরিয়েছিলেন। অনেক দেশ ঘুরে, বহুদিন পর রাজা মার্কের দেশ কর্নওয়ালে এসে ত্রিস্তানের দেখা পেলেন। ত্রিস্তানকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে রোহল্ট বললেন, 'দুঃখ, তুমিই আমার একমাত্র সুখ ছিলে। ত্রিস্তান, তুমি আমার সন্তান নও, তুমি রাজপুত্র। একবার এসো নিজের রাজ্য জয় করে নাও।

রোহল্ট রাজা মার্ককে দেখালেন রানী শ্বেতপুষ্পার অভিজ্ঞান। বললেন, ত্রিস্তান অজ্ঞাত কুলশীল নয়, রাজারই আত্মীয়, তার প্রিয় বোনের সন্তান। এখন ত্রিস্তান বড় হয়েছে। এখন ত্রিস্তানের উচিত, বাহুবলে নিজরাজ্য উদ্ধার করা এবং পিতৃহত্যার শোধ নেওয়া।

রাজা মার্ক একথা শুনে আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তখনই তিনি দেশে ফেরার জন্য ত্রিস্তানকে সব রকম সাহায্য দিলেন—অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত। লিওনেসে ফিরে এসে ত্রিস্তান ঘোরতর যুদ্ধে মেতে উঠলো। পিতৃহন্তা মর্গানের সঙ্গে সম্মুখ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে খুন করলো এবং সেই রক্তে তর্পণ করলো পিতার। নিজের রাজ্য জয় করে ত্রিস্তান এবার হল রাজা।

কিন্তু রাজা হলেও ত্রিস্তানের সুখ নেই। রাজা হওয়া বড় আটসাট ব্যাপার। সব সময় ব্যস্ত আর দায়িত্বপূর্ণ থাকতে হয়। ত্রিস্তানের ভালো লাগে না। তার বয়স তখন একুশ। এতকাল সে স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে, বনে-পাহাড়ে ঘুরেছে, একা একা বীণা বাজিয়ে গান করেছে, এখন মাথায় ভারী রাজমুকুট পরে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে তার অস্বস্তি লাগে! রাজসভায় যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয় তখন হঠাৎ তার ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে নিরালায় প্রাসাদের অলিন্দে চুপ করে বসে থাকতে।

ছেলেবেলা থেকে এ রাজ্যে যাদের সে ভালোবেসেছে, যাদের সঙ্গে সমানভাবে মিশেছে—আজ তারা দূরে থেকে শ্রদ্ধা করে। কেউ সহজভাবে কথা বলে না। নাঃ রাজা সেজে থাকা তার পছন্দ হয় না! তার বারবার মনে পড়ে রাজা মার্কের কথা, তাঁর অফুরন্ত স্নেহ ভালোবাসার কথা। কেমন স্বাধীনভাবে সেখানে বীণা বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সে জীবনই ছিল তার ভালো। তাই ত্রিস্তান তাঁর রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক আর জমিদারদের একদিন ডাকলো। ডেকে বললোঃ

বন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং আপনারা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই আমি পিতৃহন্তাকে নিহত করে প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি আমার পিতার আত্মাকে তৃপ্তি দিয়েছি। কিন্তু এছাড়াও আমার দুজন পিতৃতুল্য আত্মীয় আছেন। সত্যবাহন রোহল্ট ও কর্নওয়ালের রাজা মার্ক। এঁরাও আমার পিতা, একজন আমাকে বাল্যকালে প্রতিপালন করেছেন, একজন কৈশোরে। এঁদের কাছে আমার ঋণ আছে। আমি সেই ঋণ থেকেও মুক্ত হতে চাই।

একজন স্বাধীন মানুষের দু'রকম সম্পত্তি থাকে। নিজের শরীর আর তার জমি। এই দুই সম্পত্তি আমি উৎসর্গ করতে চাই আমার দুই পিতাকে। সুতরাং, আমার এ রাজ্য আমি রোহল্টকে দিলাম। পিতা, তুমি সর্বসমক্ষে আমার এ রাজ্য গ্রহণ করে আমাকে ঋণমুক্ত করো।

আর আমার এ শরীর আমি দেবো রাজা মার্ককে। আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো—যদিও যেতে খুব কষ্ট হবে আমার—তবুও আমি কর্নওয়ালে গিয়ে রাজা মার্কের সেবা করতে চাই। আপনারা কেউ কি এতে আপত্তি করবেন? আপনারা অনুমতি দিন, আমি রাজপদের গুরুভার থেকে মুক্তি চাই। এরকম অসাধারণ মহানুভবতার কথা ত্রিস্তানের মুখে শুনে প্রথমে সকলেই কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর একসঙ্গে আন্তরিকভাবে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন ত্রিস্তানের নামে। এ ছেলেটার মানুষের শরীর কিন্তু অন্তঃকরণটা দেবতার মতো।

## ।। দুই ।।

নিজের রাজ্য ছেড়ে ত্রিস্তান চলে এলো কর্নওয়ালে। একমাত্র গুরু গরভেনালই এতদিন পর প্রিয় শিষ্য ত্রিস্তানকে পেয়ে আর ছাড়লেন না—তিনি সঙ্গে এলেন।

কিন্তু মার্কের রাজ্যে এসে ওরা দেখলো সর্বত্র শোকের ছায়া। বন্দরে সার দেওয়া অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ। অন্য দেশের সৈন্য এসে কর্নওয়াল ঘিরে ফেলেছে। আর ঐ শত্রু সে নয়, আয়ার্ল্যান্ডের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী, যাদের অধিপতি স্বয়ং মোরহল্ট। মোহরল্টকে লোকে মানুষ বলে না, বলে দৈত্য, দৈত্যের মতোই চেহারা, অস্বাভাবিক লম্বা-প্রায় আটফুট, আর সেই রকম স্বাস্থ্য। দেখলে মনে হয় একটা চলমান পাহাড়। তার বিক্রম আর শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ নেই।

এর আগে রাজা মার্ক একবার আয়ার্ল্যান্ডের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, প্রতি বছর তিন মণ ওজনের সোনা দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর আর দেননি। ভেবেছিলেন আবার ফিরে এদেশ আক্রমণ করার শক্তি আইরীশদের নেই। রাজা মার্ক যুদ্ধ বিগ্রহে নিপুণ নন। তিনি সঙ্গীত প্রিয়, শান্তি প্রিয় রাজা। এবারের আক্রমণে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। দৈত্য মোরহল্ট আয়ার্ল্যান্ডের রাজার শালা। সে রাজা মার্কের সামনে এসে ভীমের মতন কঠিন বুক ফুলিয়ে বললো, মহারাজ, খুব সোনা ফাঁকি দিয়েছেন। এক বছরের ফাঁকি পরের বছর দ্বিগুণ হয়ে যায়। এ তো পাঁচ বছর হয়ে গেল! এবার ইচ্ছে করলে আমি আপনার রাজ্য ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু দয়া করে তা দেব না। আমি আপনার রাজ্য থেকে তিনশো যুবতি মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবো। আমাদের দেশে দাসীর বড় অভাব! তা আপনার দেশের মেয়েরা দাসী হিসেবে মানাবে ভালো! যে কোনো মেয়ে কিন্তু আমি চাই না। আমি নিজে বেছে নেবো। আজ থেকে তিনদিন পর আপনার রাজ্যের সব মেয়ে সকালবেলা এসে যার যার বাড়ির সামনে দরজার কাছে দাঁড়াবে— রাজবাড়ী, মন্ত্রীবাড়ি, সেনাপতি বাড়ি, সব বাড়ির মেয়েরা। আমি একজন একজন করে বেছে নেবো। তিনশো মেয়ে!

অথবা,... .এবার দৈত্য মোরহল্ট অট্টহাসি করে বললো। অথবা আমি কিছুই করবো না, আপনার রাজ্য ছেড়ে আমার সৈন্যরা চলে যাবে কিছুই না নিয়ে যদি আপনার রাজ্যের কোনো বীরপুরুষ একা যুদ্ধ করে আমাকে হারাতে পারে। কে আছে সে রকম বীর? তিন দিন সময় দিলাম, যা ঠিক করার ভেবে নিন। হয় যুদ্ধ নয় তিনশো জন দাসী!

অধোবদন রাজা চুপ করে রইলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন মন্ত্রী, সেনাপতি রাজ্যের সব সম্ভ্রান্ত লোকদের। অপমানে বিবর্ণ মুখে তাঁদের সামনে মোরহল্টের সব কথা বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মধ্যে কে আজ মোরহল্টের সঙ্গে যুদ্ধে রাজী? কে আজ দেশের সম্মান বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন? আমি রাজা, আমারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, আমার সে শক্তি নেই।

সভাসদরা সকলে চুপ। সকলেই মনে মনে বলতে লাগলেন, হায় হায় কে যাবে? মোরহল্টের ঐ চেহারা, ওর ক্ষমতা আর তেজের কথা কে না জানে? ওর সামনে যে যাবে তাকেই তো প্রাণ দিতে হবে। প্রাণ দিতে পারি কিন্তু তাতে তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, দেশের সম্মান বাঁচবে না। তবে শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কি?

রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন কম্পিত গলায়, বলুন কে যাবেন?

সভাসদরা তখনও চুপ। মনে মনে তাঁরা কেঁদে বলতে লাগলেন, আমাদের মেয়েদের কি এতদিন মানুষ করলুম পরদেশে গিয়ে দাসীবাঁদী হবার জন্যে? মেয়েগুলোর মুখ মনে করতে গেলেই বুক মুচড়ে ওঠে। ওদেশে নিয়ে গিয়ে কত অত্যাচার করবে কে জানে! পিতা হয়ে নিজের মেয়েকে এইভাবে ত্যাগ করতে হবে? নিজের প্রাণ দিয়েও তো তাদের বাঁচাতে পারবো না।

রাজা তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, অপনাদের মধ্যে কেউ এগিয়ে কি আসবেন না?

সভাসদরা তখনও নিরুত্তর। রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তবে আমাদের সব মেয়েদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হোক!

একজন সভাসদ হাহাকার করে উঠলেন, মহারাজ তা কি করে হয়? নিজের সন্তানদের কি করে বিষ খাওয়াবো? তাছাড়া তাতেও কি মোরহল্টের রাগ কমবে? সে রাজ্য ধ্বংস করে দিয়ে যাবে!

রাজা বললেন, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে, বলুন? মোরহল্টের সঙ্গে একা যুদ্ধ করতে পারে এমন কেউ নেই যখন—

এই সময় ধীর পদে এগিয়ে ত্রিস্তান রাজার পায়ের কাছে হাটু গেড়ে বসে শান্ত গলায় বললো, রাজা আপনি অনুমতি দিলে আমি একবার চেষ্টা করতে পারি।

ত্রিস্তান তুমি! না, না, তোমাকে আমি ছাড়তে পারবো না। তোমার এই তরুণ বয়েস, না ত্রিস্তান, তুমি না!

— না মহারাজ, আপনি অনুমতি দিন। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, এখন মোরহল্টের মুখোমুখি একবার অন্তত না দাঁড়ালে আমার আর কোনোদিন রাত্রে ঘুম হবে না! কোনোদিন কিছু একবার ঠিক করলে, আমি তার শেষ দেখতে চাই!

রাজা দেখলেন ত্রিস্তানের শান্ত মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। রাজা অনুমতি দিলেন। রাজার হৃদয় তখন গ্রীষ্মকালের দীঘির মতো, উপরের জল গরম, নিচের জল ঠাণ্ডা। একদিকে ত্রিস্তানের এই অসীম সাহসের জন্য রাজার গর্ব অন্যদিকে ত্রিস্তানকে হারাবার ভয়।

ঠিক হলো একটু দূরে একটা দ্বীপে যুদ্ধ হবে। দুপক্ষের যোদ্ধাই যাবে একা। যুদ্ধে জয়ী হয়ে দুজনের মধ্যে একজনই শুধু ফিরে আসবে। অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে ত্রিস্তান একটি ছোট নৌকায় চেপে চললো সেই দ্বীপের দিকে। তার সেই সুকুমার তরুণ মূর্তি দেখে রাজ্যের প্রতিটি লোক মনে মনে বলে উঠলো, হায়, হায়, ত্রিস্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার আগে আমরা নিজেরা কেন মরলুম না! রাজ্যের লোক ভেঙে পড়েছেন সমুদ্রের পাড়ে।

ত্রিস্তান সেই দ্বীপে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মোরহল্টও তার বিশাল পাল তোলা বিলাস নৌকো নিয়ে উপস্থিত হলো। ত্রিস্তান নিজের নৌকাটা ঠেলে ভাসিয়ে দিল জলে। তখন মোরহল্ট বিদ্রুপের সঙ্গে বললো, ও কি হে ছোকরা নৌকোটা ভেসে গেল যে! পাড়ে বেধে রাখলে না? ভয়ে এখনই হাত কাঁপছে বুঝি?

ত্রিস্তান সরলভাবে হেসে বললো, বাঃ বুঝতে পারলেন না? ফেরার সময় তো আমরা একজনই ফিরবো। একটার বেশি দুটো নৌকা লাগবে কিসে? আসুন, বরং দেরি না করে, শুরু করা যাক।

সে যুদ্ধ কেউ দেখেনি। তবে তিনবার সেই দ্বীপ থেকে বিকট আওয়াজ ভেসে এসেছিল—সেই আওয়াজে রাজ্যের লোকের বুক কেঁপেছে আর মোরহল্টের সৈন্যদের মধ্যে উঠেছে জয়ধ্বনি। মোরহল্ট শক্তিমান, ত্রিস্তান ক্ষিপ্র। এ যুদ্ধ পশুশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাসের।

প্রায় দু'ঘন্টা পর দ্বীপ থেকে একটা নৌকা ভেসে আসতে লাগলো। পাল তোলা বিশাল নৌকা। তা দেখে সমুদ্রপাড়ের লোকেরা বিষাদে আর্তনাদ করে উঠলো, হায়, হায়, মোরহল্টের নৌকা, মোরহল্ট জিতেছে! নৌকা যখন আরও একটু সামনে এলো, দেখা গেল ছাদের ওপর একজন নাইট দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে দুখানা তরবারি। লোকে চিনতে পারলো, ত্রিস্তান।

তখন সে উল্লাসের তুলনা হয় না! দেশের মুখ রক্ষা করেছে তাদের প্রিয় ত্রিস্তান। শুধু তাই নয় অতবড় মোরহল্টকে হত্যা করে আশাতীত কীর্তি স্থাপন করেছে। অসংখ্য লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো, সাঁতরে তার নৌকো আগে নিয়ে আসবে।

রাজ্যের সমস্ত লোক এলো ত্রিস্তানকে অভিনন্দন জানাতে। সমস্ত তরুণী মেয়েরা ছুটে এলো ত্রিস্তানকে চুম্বন দিতে। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে একটা হাত তুলে বললো, আপনারা শুনুন, মোরহল্ট সত্যিই বীরের মতো যুদ্ধ করেছে। এই দেখুন আমার তলোয়ার, আগা ভেঙে মোরহল্টের মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সৈন্যদের বলুন, আমাদের দেশ থেকে সেই তলোয়ারের টুকরোটাই উপহার নিয়ে এবার ওরা ফিরে যাক্!

তারপর ত্রিস্তান চললো রাজার সঙ্গে দেখা করতে। পথের দুপাশ দিয়ে অসংখ্য ফুল এসে পড়ছে তার মাথায়। হাজার হাজার যুবক যুবতী চিৎকার করে ডাকছে তার নাম ধরে। কিন্তু ত্রিস্তান যেন কিছুটা উদাসীন। কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই। রাজার সামনে এসে ত্রিস্তান বললো, মহারাজ, আমি এদেশের সম্মান রাখতে পেরেছি তো? মহারাজ, আমি আপনার.... এই কথা বলতে বলতে ত্রিস্তান দপ করে পড়ে গেল রাজার বুকের ওপর। সারা শরীর তার রক্তে রক্তময়। রাজা দেখলেন ত্রিস্তান অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মোরহল্টের সৈন্যরা, শপথ অনুযায়ী বিনা যুদ্ধে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল দৈত্যাকার মোরহল্টের মৃতদেহ। আয়ার্ল্যাণ্ডের রানী—ঐ মোরহল্টের আপন বোন। অন্যবার রানী আর রাজকুমারী বীর মোরহল্ট যুদ্ধ থেকে ফিরলে সেবা শুশ্রূষা করে শরীরের ক্ষত সারিয়ে তোলেন, কারণ রানী আর রাজকুমারী অনেক রকম বুনো ওষুধ-পত্তর জানেন, কিন্তু এবার শত ওষুধ লাগিয়েও কিছু হলো না। মৃত্যু মৃত্যুই, তার আর চিকিৎসা হয় না। মৃত মোরহল্টের মাথায় বিঁধে রয়েছে সেই তলোয়ারের ভাঙা টুকরোটা। রাজকুমারী সেটা খুলে যত্ন করে রেখে দিলেন একটা হাতীর দাঁতের বাক্সে। তারপর দুজনে প্রাণ উজার করে

কাঁদতে লাগলেন মোরহল্টের জন্য। সেই সঙ্গে তাঁরা অভিসম্পাত দিতে লাগলেন মোরহল্টের হত্যাকারী ত্রিস্তানকে। লিওনেসের ত্রিস্তানের নাম সেদিন থেকে রানী ও রাজকুমারীর দু'কানের বিষ। রানী ঘোষণা করলেন, ত্রিস্তানের মৃত্যু সংবাদ যে আনতে পারবে, তাকে রানী নিজে বুকের মুক্তামালা উপহার দিবেন।

এদিকে ত্রিস্তান তখন মৃত্যুমুখে। তার শরীরের প্রত্যেকটি ক্ষতে দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেল। সেখান থেকে অনবরত ঝরছে পুঁজ আর রক্ত। ডাক্তার কবিরাজ এসে বললে, নিশ্চয়ই মোরহল্টের তলোয়ার বিষ মাখানো ছিল। তাদের হাজার ওষুধেও ত্রিস্তানের ক্ষত সারলো না। বরং তার সারা শরীর ফুলে পচে বিশ্রী গন্ধ বেরুতে লাগলো। ত্রিস্তানের ক্ষতের গন্ধ এমন জঘন্য যে কেউ আর তার সামনে থাকতে পারে না। শুধু গুরু গরভেনাল, রাজা মার্ক এবং দিনাস নামে এক জমিদার ত্রিস্তানের পাশে থাকতেন–দুর্গন্ধ সহ্য করেও। কারণ, ওঁদের ভালবাসা ঘৃণ্যকে জয় করতে পেরেছিল।

কিন্তু ত্রিস্তান বুঝতে পারলো, লোকে তাকে করুণা করছে। বহুলোক তাকে দেখতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নাকে রুমাল চাপা দেয়। রাজা যখন পাশে বসে থাকেন, তখনও তাঁর মুখ অবিকৃত। কিন্তু ত্রিস্তান বুঝতে পারে–তিনি অতি কষ্টে ঘৃণ্য দমন করছেন। এ জীবন ত্রিস্তান চায় না। একদিন সন্ধ্যেবেলা সে নিজেই টলতে টলতে অতি কষ্টে চুপি চুপি বেরিয়ে এলো দুর্গ থেকে, তারপর সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে প্রায় গড়াতে গড়াতে এলো জলের কিনারায়। তখন রাত্রির অন্ধকার, কোথাও কেউ নেই, ক্ষতস্থানে বালি লেগে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ত্রিস্তানের। নিজেকে তার চরম অসহায় ও একা লাগলো। ত্রিস্তান কেঁদে ফেললো। অভিমান নিয়ে একবার ভাবলো এই দেশেরই সম্মান বাঁচাবার জন্য আমি মৃত্যুর মুখে গিয়েছিলাম, অথচ আজ আমি একা। এ দেশের কেউ আমার সঙ্গে নেই। রাজা মার্ক আমাকে ত্যাগ করতে চান? না, না, এখনও তিনি আমাকে ভালোবাসেন, আমার জন্য প্রাণও দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণের বিনিময়েও তো প্রাণ পাওয়া যায় না। যাক, আমাকে মরতেই হবে। আর আমার উপায় নেই। তা হলে এখানে থেকেই সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মরি। বন্ধ ঘরে শুয়ে শুয়ে মরার চেয়ে সে মৃত্যু আমার অনেক ভালো। অথবা আত্মহত্যা করলে কেমন হয়? এই জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে? কিংবা—এই সময় তার মাথায় অন্য চিন্তা এলোঃ বরং জলে ভাসতে ভাসতে আমি চলে যাই—যেদিন মৃত্যু আসবে সেদিন মরবো, লোকচক্ষুর আড়ালে।

খানিকক্ষণ বাদে রাজা মার্ক দলবল নিয়ে ত্রিস্তানকে খুঁজে পেলেন। ত্রিস্তান বললো, মহারাজ, আমি আর বাঁচবো না, বুঝতে পেরেছি। আমাকে ছোট নৌকায় করে জলে ভাসিয়ে দিন। রাজা বললেন, ত্রিস্তান, তুমি কেন অভিমান করে আমাকে ছেড়ে যেতে চাও! আমি নিজের প্রাণের বিনিময়েও তোমাকে বাঁচাবো। অথবা, দুজনেই মরবো একসঙ্গে!

কিন্তু ত্রিস্তান বারবার নৌকোর কথা বলতে লাগলো। নৌকোয় ভাসতে ভাসতেই সে মরতে চায়! সে নৌকোয় দাঁড় থাকবে না—কারণ ত্রিস্তানের বাইবার ক্ষমতা নেই। পাল থাকবে না—কারণ সে পাল গুটোতে পারবে না। অস্ত্র থাকবে না—কারণ অস্ত্র ধারণক্ষমতা আর তার নেই। থাকবে শুধু বীণা, সে ভাসতে ভাসতে চলে যাবে বীণা বাজিয়ে।

তাই চলে গেল ত্রিস্তান। ছোট্ট ডিঙি নৌকোয় চেপে সে মৃত্যুর দেশে যাত্রা করলো। সাত দিন সাত রাত্রি ধরে ভেসে চললো নৌকো। তারপর ঠেকলো এসে এক অজানা দেশের পাড়ের কাছে। জেলেরা মাছ ধরছিল, হঠাৎ শুনতে পেল টুং টাং শব্দ। একটা নৌকোয় একটা মরা মানুষ অথচ বীণা বাজছে। আসলে ত্রিস্তান তখন মরেনি, আর একটু পরেই মৃত্যু হবে—কিন্তু একটা হাত তবু বীণায় শেষ সুর তোলার চেষ্টা করছে।

জেলেরা প্রথমে ভেবেছিল বুঝি অলৌকিক কিছু। প্রথমে ভূতের ভয় পেয়েছিল তারা। তারপর একটু একটু করে এগিয়ে এসে ত্রিস্তানের অবস্থা বুঝতে পেরে মায়া হলো ওদের। ওরা ধরাধরি করে ত্রিস্তানকে নিয়ে গেল সামনের দুর্গে। সেখানে রানী ও রাজকুমারী আছেন। ওরা নানা রকম ওষুধ জানেন যদি এই বিদেশীকে দয়া করেন। যদিও রাণী ও রাজকুমারী তখন শোকে ডুবে আছেন।

ভাগ্যের কি পরিহাস। এরাই আয়ার্ল্যাণ্ডের রানী ও রাজকুমারী, মোরহল্টের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। ওদের কাছে এসে পৌছলো মোরহল্টের হত্যাকারী ত্রিস্তান কিন্তু তখন ত্রিস্তানকে চেনবার কোনো উপায় নেই। মোরহল্টের সৈন্যরাও তাকে চিনতে পারবে না। এমন মুমূর্ষু বিকৃত চেহারা হয়েছে তার।

রাজকুমারী জানতেন নানারকম লতাপাতার ওষুধ। মুমূর্ষু বিদেশীকে দেখে দয়া হলো, তিনি তাকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন। অথচ তিনি যদি জানতেন ওর সত্যিকারের পরিচয়, তবে ওষুধের বদলে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতেন নিশ্চয়।

সাতদিন পর জ্ঞান হলো ত্রিস্তানের। কোথায় সেই সমুদ্রের কল্লোল, তার বদলে সে শুয়ে আছে দুধের ফেনার মতো নরম বিছানায়। মাথার কাছে এক পরমাসুন্দরী কুমারী। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ত্রিস্তান বুঝতে পারলো, সে এসেছে শত্রুপুরীতে। তাকে বাঁচতে হবে। ত্রিস্তানের শরীর দুর্বল, কিন্তু বুদ্ধি নষ্ট হয়নি। চট করে সে বানিয়ে গল্প বললো, সে একজন পর্যটক, স্পেনে যাচ্ছিল নক্ষত্রবিদ্যা শিখতে, জলদস্যুরা জাহাজ আক্রমণ করার পর অতিকষ্টে সে ছোট নৌকোয় চড়ে পালাতে চেয়েছিল।

ত্রিস্তানের মধুর গলার আওয়াজ শুনে রাজকুমারী তার কথা বিশ্বাস করলেন। সুন্দর মুখে সকালের আলোর মতো হাসি হেসে বললেন, আচ্ছা বিদেশী তোমাকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেবো। কিন্তু তার বদলে তুমি কি দেবে আমায়?

ত্রিস্তান বললো, রাজকুমারী, আমি তো নিঃস্ব। আপনাকে প্রতিদান দেবার মতো আমার কিছুই নেই।

চাপা হাসির সঙ্গে রাজকুমারী বললেন, যতদিন প্রতিদান না দিতে পারো তুমি ততদিন এখানেই থাকো। তোমার যদি অন্য দেশ না থাকে, তুমি এদেশেই থেকে যাও না চিরকাল! রাজকুমারী অপরূপ, উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়েও ভয়ে ত্রিস্তানের বুক কাঁপতে লাগলো। তার সত্য পরিচয় শুনলে, এই সুন্দর মুখও এই মুহূর্তে ভয়ঙ্করভাবে বদলে যাবে। না, তার এখানে থাকা হবে না। এই মধুর হাতের সেবা ছেড়েই তাকে চলে যেতে হবে। তার নিজের মুখের আসল চেহারা ফিরে আসার আগেই। সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগেই চলাফেরা করার একটু ক্ষমতা যেই পেল ত্রিস্তান, ধরা পড়ার ভয়ে গোপনে পালিয়ে এলো সেখান থেকে। রাজকুমারী তখন ঘুমিয়ে, শেষবার ত্রিস্তান তাঁর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলো।

## ।। তিন ।।

রাজা মার্কের রাজ্যে এখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ। দেশ শত্রু মুক্ত, ত্রিস্তান ফিরে এসেছে। রাজা মুগ্ধ হয়ে ত্রিস্তানের বীণার বাজনা শোনেন।

কিন্তু হুজুর, আপনারা জানেন,. দিনের আলোয় যখন সারা দুনিয়াটা ঝক্‌মক্‌ করে, তখনও মানুষের ছায়া পড়ে। জীবন কখনও সরল পথে চলতে জানে না! যতই আলো থাক্‌, তার মধ্যেও ছায়া থাকবে। রাজা মার্কের রাজ্যে সবাই ত্রিস্তানকে ভালবাসে, শুধু চারজন নাইট ছাড়া। এই চারজনই রাজার একটু একটু আত্মীয়, আগে ছিল রাজার প্রিয়পাত্র, এখন ত্রিস্তান এসে সে জায়গা কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং ত্রিস্তানের ওপর ওদের ঈর্ষা হবে। –এ তো মানুষের ধর্ম।

এ চারজন সারা রাজ্যে ফিসফিস গুজগুজ করে রটাতে লাগলো যে, ত্রিস্তান একজন যাদুকর। নইলে এ রকম অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা একটা মানুষের জীবনে বারবার ঘটে কি করে? মোরহল্টের মতো অমন একজন দৈত্যের মতো বীরপুরুষকে মারলো সেটাই আশ্চর্যের কথা। তারপর ওরকম মুমূর্ষ অবস্থায় সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হলো– তবু বেঁচে ফিরে এলো কি করে! রাজার ছেলেপুলে নেই, শেষ পর্যন্ত ত্রিস্তানকেই হয়তো যুবরাজ করবেন। শেষ পর্যন্ত দেশটা চলে যাবে যাদুকরের হাতে। সে যুগের মানুষ মায়াবী বা যাদুকরের নাম শুনলেই ভয় পেতো। কত মেয়েকে ডাইনী মনে করে পুড়িয়ে মেরেছে আপনারা জানেন। হা কপা, ডাইনীই যদি হবে, তবে সে পুড়ে মরবে কেন?

তখন তারা ধরে পড়লো রাজাকে বিয়ে করতে হবে। রাজার একটি বংশধর চাই। রাজা এ কথাতে কান দিতে চান না। অথচ সেই নাইট চারজন প্রত্যেকদিন রাজসভায় এসে এ-কথা বলতে লাগলো।

যেদিন ত্রিস্তান বুঝতে পারল ঐ নাইট চারজনের উদ্দেশ্য কি, তখনই লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছে হলো। ছিঃ ছিঃ তাকে এত নীচ ভাবেন! সে কি নিজের রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আসেনি? রাজা মার্ককে যে সে ভালোবাসে, সে কি রাজ্যের লোভে? তখন ত্রিস্তানও রাজাকে জোর করতে লাগলো বিয়ে করার জন্য। নইলে ত্রিস্তান রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। রাজ্যের লোকের সন্দেহের কারণ সে হতে চান না।

রাজা মার্ক দেখলেন মহা মুশকিল। কিছুতে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ত্রিস্তান থাকতে তার আর পুত্রের দরকার কি! কিন্তু হঠাৎ উপায় পেয়ে গেলেন। একদিন তিনি স্নান করছেন, এমন সময় জানালায় দুটো দোয়েল পাখি উড়ে এসে বসলো। তারপর ফুরুত করে উড়ে যাবার সময় মুখ থেকে এক গাছি সোনালী চুল ফেলে গেল একটা পাখি। রাজা তুলে দেখলেন সাধারণ সোনালী চুল নয় ঠিক যেন সোনার পাতলা সুতো– সেই রকম রং, সেই রকম উজ্জ্বলতা, অথচ চুল যে তাও অবিশ্বাস করা যায় না।

রাজা সেই চুলটা এনে রাজসভায় বললেন, আমি বিয়ে করতে পারি একটি মাত্র মেয়েকে। সে কোথায় আছে আমি জানি না। কিন্তু এই তার মাথার চুল। একে তোমরা খুঁজে দিতে পার তো বিয়ে করবো! এমন মুচকি হাসলেন রাজা, যার মানে কেমন জব্দ করেছি তোমাদের! এরকম মেয়ে তো আর কোথাও পাবে না কেউ!

এ কথায় নাইটরা সবাই কালো মুখে ত্রিস্তানের দিকে তাকালো। সকলেই ভাবলো, এ নিশ্চয়ই ত্রিস্তানের কারসাজি। ত্রিস্তানই রাজাকে এই পরামর্শ দিয়েছে তাদের ঠকাবার জন্য।

সেই সোনালী চুলটা দেখে ত্রিস্তানের যেন অস্পষ্টভাবে একটা ছবি মনে পড়লো। একটি প্রস্ফুটিত সুন্দর মুখ –দুটি হ্রদের মতো গভীর চোখ আর এক মাথা সোনালী চুল। তার শিয়রের পাশে বসেছিল। হ্যাঁ মনে আছে, সে যখন মাথা দুলিয়ে হেসেছিল, তখন ঝিলমিল সোনালী চুলের গুচ্ছ কেঁপে উঠেছিল শরৎকালে সোনাঝুরি গাছের মতন! স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ত্রিস্তানের সেই মুখ। সেই কন্যা তাঁর রাজ্যে থাকতে বলেছিলেন। তাঁর চাঁপার কলির মতো আঙুল বুলিয়েছিলেন ত্রিস্তানের কপালে।

ত্রিস্তান যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বললে, রাজা আমি জানি কোথায় আছে সেই কন্যা। কিন্তু সে যে আমার পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর দেশ। আমি সেখানে গেলে বোধাহয় প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবো না। তবু আমাকে যেতেই হবে। নইলে আপনার নাইটরা ভাববে, আমি আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সোনালী চুলের কথা বলেছি। আপনি আশির্বাদ করুন, আমি এবারও যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারি।

সঙ্কটের মধ্যে পড়ে রাজার শরীর কাঁপতে লাগলো। তাঁর মুখে ভাষা নেই। ত্রিস্তান নতজানু হয়ে রাজার সামনে বসে বললো, মহারাজ, যদি শেষ পর্যন্ত প্রাণ থাকে, আমি সেই রাজকন্যাকে জয় করে এনে আপনার হাতে সঁপে দেবো। এই আমার শপথ।

ত্রিস্তান একশোজন বাছা বাছা সৈন্য সঙ্গে নিয়ে একটা বিরাট জাহাজ সাজালো। সঙ্গে নিল প্রচুর খাদ্য ও মদ্য, মধু, রেশমী পোশাক, জরির কিংখোব। সৈন্যদের সাজালো ব্যবসায়ীর বেশে। তারপর জাহাজ ছেড়ে দিলো।

দু'দিন যাবার পর সৈন্যরা জিগ্যেস করলো, প্রভু আমরা কোন্ দেশে যাচ্ছি?

–আয়ার্ল্যান্ড? সোজা হোয়াইটহ্যাভেন বন্দরের দিকে জাহাজ চালাও।

– আয়ার্ল্যান্ড? সে কি? সৈন্যরা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ত্রিস্তানের কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই সেদিন মোরহল্টকে হত্যা করার পর আয়ার্ল্যান্ডের সৈন্যরা অপমানে ফিরে গেছে। এখন ত্রিস্তানকে হাতে পেলে ওরা ছিঁড়ে ফেলবে না? তাও ত্রিস্তান যাচ্ছে মাত্র একশোজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে?

– ভয় কি, আমরা তো যাচ্ছি ছদ্মবেশে। বুকে যদি সাহস থাকে কেউ ছদ্মবেশ ছিঁড়তে পারবে না।

আয়ার্ল্যান্ডের বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়লো। সবাই জানলো দূর দেশ থেকে একটা বাণিজ্য জাহাজ এসেছে। অবশ্য এ জাহাজের বণিকরা একটু অদ্ভুত ধরনের।

ব্যবসায়ে বিশেষ মন নেই, দিনরাত তাশ পাশা খেলে কাটায়। দিন কাটতে লাগলো, ত্রিস্তান রাজবাড়িতে যাবার কোনো সুযোগ পেল না। কিছুটা অভিমান ও ঝোঁকের মাথায় সে চলে এসেছে, কিন্তু জানে না কি করে শত্রু পুরীর রাজকন্যাকে জয় করবে। কোনো উপায় সে ভেবে পায় না।

হঠাৎ এক সকালে সুযোগ এলো। ভোরবেলা ত্রিস্তান বন্দরের পাড় দিয়ে হাঁটছে, হঠাৎ পালাও পালাও রব উঠলো। লোকজন ছুটে পালাতে লাগলো, একজন অশ্বারোহী ভীত মুখে পালিয়ে গেল ঝড়ের বেগে। ত্রিস্তান একজন পলায়মানা রমণীর হাত চেপে ধরে বললো, কি ব্যাপার, পালাচ্ছেন কেন? কি হয়েছে?

রমণী কাতরস্বরে, বললো আমায় ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি।

– কেন পালাচ্ছেন, না বললে কিছুতেই ছাড়বো না।

–তুমি জানো না? ড্রাগন এসেছে। রোজ এসে শহর থেকে একটা করে মেয়ে ধরে নিয়ে খায়। আজ একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

– ঠিক আছে, ভয় নেই। আমি যাচ্ছি ওটাকে আটকাতে।

খবরদার, ওরকম মূর্খোমি করো না। তুমি পাগল নাকি।

কেন ওকে মারা কি মানুষের পক্ষে অসম্ভব?

– তা জানি না, তবে এটুকু জানি কুড়িজন নাইট ওকে মারতে গিয়ে নিজেরাই মরে গেছেন। এদেশের রাজা ঘোষণা করেছেন, যে ওটাকে মারতে পারবে, তার সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে দিবেন।

একথা শুনে ত্রিস্তান হাসলো। হারলে মৃত্যু জিতলে রাজকুমারী। এই তো সে চেয়েছিল। তারপর জাহাজে ফিরে বর্মে সজ্জিত হয়ে আবার বেরিয়ে এলো। সব লোক যেদিক ছুটে পালাচ্ছে ত্রিস্তান একা এগিয়ে গেল সেদিকে সাদা ঘোড়ায় চড়ে। তার তরুণ মুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই। একটু পরে ত্রিস্তান জানোয়ারটাকে দেখতে পেল। মুখটা শুয়োরের মতো, জ্বলন্ত কাঠকয়লার মতো দুটো চোখ, সিংহের মতো থাবা; কিন্তু শরীরটা কুমীরের। এই সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগন। ত্রিস্তান সোজা ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো ওকে। ঠক্ করে লেগে বর্শাটা ভেঙ্গে গেল, হুমড়ি খেয়ে গেল ঘোড়াটা। ত্রিস্তান তখন খোলা তলোয়ার চালালো, কিন্তু ঠক করে শব্দ হলো শুধু, একটুও আঘাত লাগল না ওর। ড্রাগনটা থাবা মেরে ত্রিস্তানের বর্ম ধরে টান মারতেই, বর্ম সামনের দিকে খানিকটা ভেঙে গেল। ত্রিস্তানের বুক তখন উন্মুক্ত। এবার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তলোয়ার চালালো ত্রিস্তান, কিন্তু বৃথাই, জন্তটার শরীর যেন ইস্পাতের তৈরী। জন্তুটা নাক দিয়ে এমন আগুনের হল্কা ছাড়লো যে বুকের কাছটা সম্পূর্ণ ঝলসে গেল ত্রিস্তানের। ত্রিস্তান বুঝলো সে আর দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু মরার আগে প্রতিশোধ নিয়ে যাবে না? আর এক পা সামনে এগিয়ে এলো ত্রিস্তান। ড্রাগনটা এবার হাঁ করে ওকে গিলতে এলো, ত্রিস্তান সোজা তলোয়ার চালিয়ে দিল ওর মুখের মধ্যে। সেই এক আঘাতেই জন্তুটার হৃদপিন্ড চিরে গেল। বিকট চিৎকার করে পড়ে গেল জন্তটা। ত্রিস্তানও তখন টলছে। নিচু হয়ে ওটার জিভটা কেটে নিয়ে নিজের মোজার মধ্যে রাখলো। তারপর কয়েক পা এগিয়ে আসতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ত্রিস্তান। গড়াতে গড়াতে নিচের ঝোপে গিয়ে আটকালো। জন্তুটার বিষ নিঃশ্বাসে ত্রিস্তানের বুক পুড়ে গেছে।

প্রথমেই ত্রিস্তান ঝড়ের বেগে যে অশ্বারোহীকে পালাতে দেখেছিল সে হচ্ছে লাল-চুলো নাইট। তার মাথার চুল লাল বলে লোকে তাকে লাল-চুলো বলে। লোকটা নাইট হলেও, ভীতুর ডিম আর লোভী। রাজকুমারীকে বিয়ে করার খুব ইচ্ছে ওর, রোজই একবার ড্রাগনটাকে মারার জন্য সেজে গুজে আসে, তারপর ড্রাগনটার প্রথম ডাক শুনেই পালিয়ে যায়। আবার পরের দিন আসে। ভালোবাসার এমনই টান যে কাপুরুষকেও দুঃসাহসী হতে লোভ দেখায়। সেদিন হঠাৎ কি হলো, প্রথমবার পালিয়ে যাবার পর লাল-চুলোর মনে অনুতাপ এলো। রোজই এরকম পালিয়ে যাওয়া? নাঃ আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক, হয় ড্রাগন মরুক নয় আমি মরি।

লাল-চুলো ফিরে এসে দেখে ড্রাগনটা মরে পড়ে আছে, আশেপাশে আর কেউ নেই। তখন আনন্দে সে একা একাই একটু নেচে নিলো। সে ভাবলো ভগবান বুঝি তার হয়ে ড্রাগনটাকে মেরেছেন। লাল-চুলো তখন তাড়াতাড়ি এসে পুচিয়ে পুচিয়ে ড্রাগনটার মাথা কেটে ফেললো, তারপর সে ছিন্নমুন্ড হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে গিয়ে বললো, কই মহারাজ, এবার রাজকুমারীকে ডাকুন।

আয়ার্ল্যান্ডের রাজকুমারীর নাম সোনালী চুল ইসল্ট। অনেকে তাকে ডাকে সোনালী চুল বলে, অনেকে ডাকে শুধু সোনালী। রাজকন্যা সোনালী যখন শুনলেন ঐ ভীতুর ডিম লাল-চুলো নাইটই ড্রাগনটাকে মেরেছে। এবং সে-ই তাকে বিয়ে করবে- তখন তিনি হাসতে হাসতে আর বাঁচেন না। তারপর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে হাসতে হাসতেই কাঁদতে লাগলেন। ঐ লাল-চুলো মেরেছে ঐ ড্রাগন। সূর্য তো পশ্চিম দিকে উঠেনি। পাখিরা তো বোবা হয়ে যায়নি। সমুদ্র তো নিস্তব্ধ হয়নি হঠাৎ, তবু, এই অসম্ভব কান্ড হলো কি করে? নিশ্চয়ই কোনো জোচ্চুরি আছে। রাজকন্যা ঠিক করলেন, সখীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গোপনে মরা ড্রাগনটা দেখে আসবেন।

ড্রাগনের পাশে একটা ঘোড়া মরে আছে। ঘোড়ার এরকম সাজ পোশাক তো এ দেশের নয়। রাজকন্যা বুঝলেন কোন বিদেশী এসে ড্রাগনটা মেরেছে, কিন্তু কোথায় সে বিদেশী? সে কি এখনও বেঁচে আছে। সখীরা খোঁজাখুজি করতে লাগলো। শেষে প্রিয়সখী বিরজা দেখতে পে; দূরে ঝোপের মধ্যে কার শিরস্ত্রাণ চক্‌চক্ করছে। ছুটে গেলেন সবাই। তখন জ্ঞান নেই ত্রিস্তানের, কিন্তু অল্প অল্প নিশ্বাস পড়ছে। ধরাধরি করে গোপনে ত্রিস্তানেকে নিয়ে আসা হলো রাজপুরীর মধ্যে। সোনালী তাঁর মাকে শুধু বললেন সব কথা, দেখালেন সেই বীরপুরুষের অজ্ঞান দেহ। ওর মা তাড়াতাড়ি ওষুধ লাগাবার জন্য, ত্রিস্তানের পোশাক খুলতে গিয়ে জুতোর মধ্যে দেখতে পেলেন সেই ড্রাগনের জিভ। মা আর মেয়ে চোখাচোখি তাকালেন। তারপর খুব তেজী ওষুধ অল্প সময়েই জ্ঞান ফেরালেন ত্রিস্তানের।

চোখ মেলতেই রানী বললেন, বিদেশী, তুমি কে জানি না, কিন্তু এ কথা বুঝেছি, তুমিই ড্রাগনকে হত্যা করেছো। এদিকে লাল-চুলো নামে একজন নাইট দাবী করেছে সেই মেরেছে ড্রাগনটাকে। তুমিই আমার মেয়ের যোগ্য স্বামী; তোমার সঙ্গেই মানাবে। ঐ কাপুরুষটার সঙ্গে নয়। এমন সোনার প্রতিমা আমার মেয়ে, তার সঙ্গে কি বাদরটাকে মানায়। তুমি দুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে ওর সঙ্গে লড়াই করে ওকে হারাতে পারবে? তোমাকে পারতেই হবে। তোমাকে যে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

প্রভুগণ, দেখুন, ঈশ্বরের কি কৌতুক। রানী এক পলক দেখেই ত্রিস্তানকে পছন্দ করে ফেললেন। অথচ ওই রানীই ত্রিস্তানের মৃত্যুসংবাদ শুনলে নিজের গলার মুক্তামালা দেবেন, ঘোষাণা করেছেন।

ত্রিস্তান বললো, দেবী আপনি ওষুধ দিয়ে আমার গায়ে জোর ফিরিয়ে আনুন। আমি ড্রাগনকে মেরে রাজকুমারী সোনালীকে জয় করেছি, ঐ নাইটকে হারিয়েও আর একবার জয় করতে পারবো।

রাজপুরীর মধ্যে গোপনে ত্রিস্তানের সেবা করছেন রাজকন্যা সোনালী নিজে। পরদিন সকালে ত্রিস্তানকে স্নান করিয়ে ক্ষতের জায়গায় মলম লাগাতে এসেছেন রাজকুমারী। ত্রিস্তান তখনও ঘুমিয়ে। ত্রিস্তানের তেজস্বী সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজকুমারী একটা আদরের দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই মুখ যেন অল্প অল্প চেনা লাগছে। হয়তো, পূর্ব জন্মে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ইস, এর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি লাল চুলোর সঙ্গে বিয়ে হত? লজ্জায় আত্মহত্যা করতে হত তাহলে। এই বিদেশী আমাকে বাঁচিয়েছে। কালকে এর পক্ষে লালচুলোকে হারানো তো কিছুই না!

ঘুম ভেঙে ত্রিস্তান দেখলো সোনালীকে। একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মনে মনে ভাবলো, সোনালী চুল রাজকন্যাকে তাহলে আমি সত্যিই খুঁজে পেলাম। এই ভেবে ত্রিস্তান একটু হাসলো। সেই হাসি কেমন যেন অদ্ভুত, রাজকন্যা দেখে চমকে উঠলেন

ওরকম ভাবে হাসলো কেন বিদেশী? আমার কি কিছু ভুল হয়েছে? আমার পোশাক আগোছালো না তো! তবে ওরকম ভাবে হাসলো কেন? কি জানি?

রাজকুমারী তখন ত্রিস্তানের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করা জন্য বার করলেন। আহা, কি সুন্দর শিরস্ত্রাণ, ওর মত বীরেরই যোগ্য। কি বিশাল তলোয়ার। এই তলোয়ার দিয়ে ড্রাগনকে মেরেছে, কাল লাল-চুলোকেও মারবে। একি তলোয়ারের ডগাটা ভাঙ্গা কেন? ড্রাগনকে মারতে গিয়ে ভাঙল! ভাঙা তলোয়ার দেখে সোনালীর কি রকম যেন অস্বস্তি লাগলো। যতখানি ভাঙা সে রকম একটা টুকরো যেন তিনি কোথায় দেখেছেন। কোথায়? ও! শঙ্কায় সোনালীর বুক দুলে উঠলো। তাঁর মামা মোরহল্টের মাথার খুলির মধ্যে তো এই রকম একটা টুকরো ঢুকে ছিল। হে ভগবান, যেন তা না হয়! তাড়াতাড়ি গিয়ে হাতির দাঁতের বাক্স খুলে টুকরোটা বার করে আনলেন। জোড়ে জোড়ে মিলে গেল। ওঃ এই বিদেশীই তবে লিওনেসের ত্রিস্তান। মোরহল্টকে খুন করেছে এই লোকটাই! হায়, আমার ভাগ্য!

রাগে রাজকুমারী তলোয়ার হাতে ছুটে এলেন ত্রিস্তানকে খুন করার জন্যে। ত্রিস্তান। তখন স্নান করছে, জলভর্তি বড় গামলার মধ্যে শুয়ে, অসহায় নিরস্ত্র ত্রিস্তান। তলোয়ার উঁচিয়ে ক্রোধে কঠিন গলায় ত্রিস্তানকে বললেন রাজকুমারী, শয়তান, তুমিই মোরহল্টের হত্যাকারী? সত্যি করে বলো, তুমিই কি লিওনেসের ত্রিস্তান? তাহলে এবার মৃত্যুর জন্য তৈরী হও।

ত্রিস্তানের পালাবার উপায় নেই। সে শুয়ে থেকে মৃদু হেসে বললো, রাজকুমারী, তোমার হাতে মরবো তাতে আমার দুঃখ কি। এজীবন তো তোমারই। মরার আগে একটা কথা বলবো। আমার জীবন তুমিই দ'বার বাঁচিয়েছো! মনে আছে সেই মুমূর্ষু বাণীবাদকের কথা? জেলেরা তোমার কাছে এনেছিল? সে আমি। তখনও তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছো। এবারও ড্রাগনকে হত্যা করার পর আমি ঝোপের মধ্যে পড়েছিলাম, আমার বাঁচার কথা ছিল না- তুমিই তুলে এনে আমাকে বাঁচালে। দু'বার আমার প্রাণ বাঁচালে, এখন একবার হত্যা করবে, এ আর বেশী কথা কী। আমাকে হত্যা করলেও আমি তোমার কাছে ঋণী থেকে যাবো।

রাজকুমারী বললেন, প্রথমবারই যদি জানতুম তোমার সত্যিকার পরিচয় তখনই তোমাকে মেরে ফেলতাম!

- তার বদলে এখন মারো! এরপর লাল-চুলো নাইটকে বিয়ে করে সুখে থাকবে তুমি। একবারও তোমার দীর্ঘশ্বাস পড়বে না একথা ভেবে একজন বিদেশী তোমাকে পাবার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করেছিল। তারপর অসহায় অবস্থায় পেয়ে স্নানের ঘরে তুমি তাকে হত্যা করেছো।

- এ সব কি অসম্ভব কথা? তুমি মোরহল্টকে হত্যা করেছো- এ দেশ তোমার শত্রুর দেশ। আর তুমিই এসেছো এ দেশের রাজকন্যাকে পেতে। বুঝেছি, মোরহল্ট গিয়েছিল তোমাদের দেশ থেকে ক্রীতদাসী আনতে, তার বদলে তুমি এসেছো এ দেশেও রাজকন্যাকে ক্রীতদাসী করে নিয়ে যেতে।

রাজকুমারী, না, না, ও কথা ভেবো না। একদিন একটা দোয়েল পাখি মুখে করে এনেছিল একগাছি সোনালী চুল! তা দেখে আমার মনে পড়েছিল তোমার কথা। তাই তোমাকে পাবার জন্য আমি জীবন তুচ্ছ করে এসেছি এ দেশে। দেখো, আমার জামার সঙ্গে

সেই সোনালী চুলটা সেলাই করা আছে। তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

তলোয়ার হাতে নিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন রাজকুমারী। এই লোকটাই হত্যা করেছে তাঁর মায়ের একমাত্র ভাইকে। এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরকে। ওকে মারতে তাঁর হাত কাঁপছে কেন? কেনই বা গলা রুদ্ধ হয়ে আসছে, ডাকতে পারছে না প্রহরীদের?

ত্রিস্তান আবার বললো, দ্বিধা করছো কেন, রাজকুমারী? আমাকে মারো, আমি বুক পেতে দিয়েছি। আমি তোমার হাতেই মরতে চাই। পরের জন্মে আবার আসবো তোমার কাছে, তোমাকে জয় করতে। সেবারও হয়তো আমি মরবো তোমার হাতে। তখনও হয়তো তোমার রাগ যাবে না। কিন্তু আমি বরাবর জন্মজন্মান্তরে ঘুরে আসবো তোমাকে জয় করতে। আমি তোমাকে চাই।

তলোয়ার ফেলে দিয়ে সোনালী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এই বিদেশী এসেছে তাঁকেই ভালোবেসে, একে কি করে খুন করবেন নিজের হাতে।

– কেন এলে নিষ্ঠুর বিদেশী, কেন এলে এদেশে? কেন আমাকে এই দ্বিধার মধ্যে ফেললে।

রাজকুমারী আমি এসেছি শুধু তোমারই জন্য, আমি আমার নিজের জীবনের কথাও ভুলে গেছি। তুমি অথবা মৃত্যু, এই দুজনের একজন এসো আমার কাছে।

রাজকুমারী, আর স্থির থাকতে পারলেন না। এ রকম কথা তিনি কখনও শোনেননি। সোনালী এগিয়ে দুর্বল ত্রিস্তানের ওষ্ঠ চুম্বন করে বললেন, আমি হেরে গেলাম। আজ থেকে তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু, তুমি আর কখনও আমার ওপর নিষ্ঠুর হয়ো না। ত্রিস্তান তখন আবার সেই আগের মতো অদ্ভুতভাবে হাসলো। তার গৌরবর্ণ মুখে সেই হাসিটুকু যেন অন্ধকারের মতো দেখালো। রাজকুমারী এবারও তার মানে বুঝতে পারলেন না।

রানী ও রাজকন্যা রাজাকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। ত্রিস্তানের পরিচয়, তাঁর বীরত্বের কথা। রাজা প্রথমে খুব রেগে উঠলেন সে-ই মোরহল্টের হত্যাকারী শুনে । তারপর বুঝলেন, ত্রিস্তান ন্যায় যুদ্ধেই মোরহল্টকে হারিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ত্রিস্তানকে ক্ষমা করলেন তিনি।

লাল-চুলো নাইট ত্রিস্তানের পরিচয় শুনে ভয়ে আর লড়াই করতে চাইলো না। রাজা তাকে জেলে পুরলেন। ঠিক হলো কয়েকদিন পর ত্রিস্তানের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবে।

বিরাট জমকালো রাজসভায় ত্রিস্তান ও সোনালীকে পাশে নিয়ে রাজা ঘোষণা করলেন বিবাহের কথা। ত্রিস্তান ছাড়া কেউ ড্রাগনকে হত্যা করতে সাহস পায়নি- সেই রাজকন্যার যোগ্য অধিকারী। রাজসভায় ত্রিস্তানের সেই একশোজন সৈন্য ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রাজার কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে ত্রিস্তান বললো মহারাজ, আমি ড্রাগনকে হত্যা করেছি। এবং আপনার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমি রাজকন্যাকে আমার জাহাজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমার অন্য একটা প্রস্তাব আছে। আমি এসেছি কর্নওয়ালের রাজা মার্কের অনুচর হিসেবে। মহারাজ, আমি কেউ নই। আমি রাজা মার্কের ভৃত্য মাত্র। রাজকুমারীকে আমি বিয়ে করবো না, ওঁকে বিয়ে করবেন রাজা মার্ক। তার ফলে আয়ার্ল্যান্ডের সঙ্গে কর্নওয়ালের চিরকালের বিবাদ মিটে যাবে। সমস্ত কর্নওয়ালের লোক রাজকুমারী সোনালীর অনুগত হবে তাদের রানী হিসাবে।

একথা শুনে কেউ আশ্চর্য হলো না। হায়, পদমর্যাদার প্রতি মানুষের এমন ভক্তি। সবাই ভাবলো, এদেশের রাজকন্যার সঙ্গে ওদেশের রাজার বিয়ে হবে, সেই তো স্বাভাবিক! ত্রিস্তান আবার কে? সে তো ভৃত্য মাত্র। সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। রাজা এ প্রস্তাবে আন্তরিক ভাবে খুশী হলেন।

রাজা ত্রিস্তানের হাতের ওপর রাজকন্যার হাত রেখে বললেন, ত্রিস্তান তুমি রাজা মার্কের প্রতিনিধি হিসেবে আমার মেয়েকে গ্রহণ করলে। এখন প্রতিজ্ঞা করো, তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বস্তভাবে একে স্বামীর কাছে পৌছে দেবে?

রাজকুমারী সোনালী তখন লজ্জায়, অপমানে, রাগে থরথর করে কাঁপছে। এই ছিল লোকটার মনে? ভন্ড, মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর! সোনালী চুলের কথা, ভালোবাসার কথা সব মিথ্যে? নিজে জয় করে এখন অবহেলায় দিয়ে দিচ্ছে অন্যকে! নিজের হাতে সে তাঁকে অন্যের হাতে তুলে দেবে! ওঃ এর আগে তাঁর মৃত্যু হলো না কেন।! বিশ্বাসঘাতক ত্রিস্তান! ও লোকটার হৃদয় নেই। রাজকন্যা সভার মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

ত্রিস্তান রাজার সামনে প্রতিজ্ঞা করলো।

## ।। চার ।।

যেদিন জাহাজে ত্রিস্তান রাজকুমারীকে নিয়ে যাবে, সেদিন রানী তাঁর মেয়ে সোনালীকে সাজিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ অচেনা অজানা দেশে তুই যাবি, তোর সখী বিরজাও তোর সঙ্গে যাক্। যাক্ আরও দাসদাসী। তাহলে তোর একা লাগবে না। ভয় করবে না। সোনালী বললেন, মা, আমাকে তোমরা পাঠাচ্ছো শত্রুর দেশে। আমি আর ক'দিন সেখানে বাঁচবো? আমার কিছু দরকার নেই। রানী বললেন, আমার চোখে জল আসছে, কিন্তু তবু আমি কাঁদবো না। ওরা যে তোকে জয় করে নিয়েছে।

তারপর রানী বিরজাকে আলাদা ডেকে বললেন, বিরজা, তোর ওপরেই ভার দিলুম ওকে দেখাশোনা করার। তুই ছেলেবেলা থেকে ওর সঙ্গে আছিস। তোকে ছাড়া ও বাঁচবে না। আর এই নে এই কলসীটা। এটা খুব গোপনে রাখবি। খুব সাবধান। এতে আছে মন্ত্রপূত আরক। বিয়ের দিন এই আরক তুই রাজা মার্ক আর সোনালীকে দিবি। দুজন নারী পুরুষ যদি পাশাপাশি বসে এই আরক খায়, তবে তারা সারাজীবন পরস্পরকে ভালোবাসবে। ওদের ভালোবাসা আর মৃত্যু এক সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। দুজনের প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক নিশ্বাস মিলে যাবে এক ভালোবাসায়, এক মৃত্যুতে। দেখিস, খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখিস কলসীটা।

আয়ার্ল্যাণ্ডের লোক চোখের জলে বিদায় দিল ওদের। জাহাজ সমুদ্রে ভাসলো। অকূল সমুদ্র, এ জাহাজ চলছে কোন অচেনা দেশে, এ কথা ভেবে রাজকুমারী বিরজার সঙ্গে বসে কাঁদেন। ত্রিস্তানকে তিনি দু'চোখে দেখতে পারেন না। ত্রিস্তান কাছে এলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই লোকটা তার জীবনে এলো কোন শনিগ্রহ হয়ে! এ খুন করলো মোরহল্টকে, বাবা মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে এখন তুলে দেবে কোন অচেনা লোকের হাতে! অথচ, এই লোককেই তিনি দু'দু'বার বাঁচিয়েছেন! সমুদ্র, তুমি এ পাপ সহ্য করছো? ঝড় তুলে বরং তুমি আমায় ডুবিয়ে মারো! এ অপমান আমার আর সহ্য হয় না!

একদিন সমুদ্রে একটুও হাওয়া নেই। পাল তোলা জাহাজ হাওয়া ছাড়া চলে না। জাহাজের সব সৈন্যরা কাছাকাছি একটা দ্বীপে নেমে গেল বনভোজন করতে। রাজকুমারী কিছুতেই যাবে না। সৈন্যরা তখন অনেক অনুনয় করে বিরজাকে টেনে নিয়ে গেল। ত্রিস্তান একা রইলো সোনালীকে পাহারা দিতে।

ত্রিস্তান কাছে এসে বললো, রাজকুমারী, আমার ওপর রাগ করো না।

সোনালী বললেন, তুমি দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। নইলে আমি জলে ঝাঁপ দেবো।

ত্রিস্তান দূরে সরে গেল। দাঁড়িয়ে রইল একা।

ত্রিস্তান একা জাহাজের রেলিং-এ ভর দিয়ে ভাবে, রাজকুমারী কেন তাকে ভুল বুঝলো? সে যা কিছু করেছে, সবই তো কর্তব্যের জন্য। রাজার কাছে শপথ রক্ষার জন্য। কিন্তু তার নিজের মনও ঠিক মানতে চায় না। বাইরে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুক টনটন করে উঠে। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় রাজকুমারীর দিকে। তার বড় ইচ্ছে করে, রাজকুমারী সোনালীর পাশে গিয়ে বসতে, তার সুন্দর মুখ থেকে দু'একটা কথা শুনতে। যত সামান্য কথাই হোক না।

ঐ যে ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা বাহুতে মুখ ডুবিয়ে বসে আছে, ছড়িয়ে পড়েছে একমাথা সোনার রেশমের মত চুল—ওর ঐ শরীরে কি মায়া লুকানো আছে—যাক তাকে টানছে বারবার। অন্য কোনো কাজে তার আর মন নেই—এই নির্জন জাহাজে ত্রিস্তানের সমস্ত মনপ্রাণ ঐ মেয়েটির দিকে। অথচ ও কাছে যেতে পরছে না।

ত্রিস্তান এতদিন কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি। মেয়েদের কথা কখনও তার তেমন করে মনেই পড়েনি। সোনালী একমাত্র মেয়ে—অসুস্থ অবস্থায় ত্রিস্তান যার স্পর্শ পেয়েছে। ত্রিস্তান সারা শরীর দিয়ে অনুভব করতে লাগলো সেই স্পর্শ। এরকম অনুভব তার জীবনে আগে কখনও হয়নি। একা দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। অতবড় বীরপুরুষ সে, কিন্তু রাজকুমারীর কাছে যেতে আজ তার ভয় হচ্ছে। জোর করে কাছে গেলে কি যেন একটা ভেঙে যাবে। কি যেন একটা সে সারাজীবনের মতো হারাবে। মেয়েদের সম্পর্কে তার তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তবু কেমন করে যেন জেনে গেছে—জোর করে মেয়েদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায় না।

প্রভুগণ, আপনারা বুঝতে পারছেন ত্রিস্তানের অবস্থা? এতদিন তার শরীর বৃদ্ধি পেলেও সে ছিল বালক। বালক স্বভাবের লোকেরা যুদ্ধ বিগ্রহ বেশী ভালোবাসে। এতদিনে, আজ ত্রিস্তান পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, সে কোনো যুদ্ধেই জেতেনি। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে এখনও পায়নি।

খানিক্ষকণ পর রাজকুমারী চেঁচিয়ে উঠলেন, ওঃ, আমার তেষ্টা পেয়েছে। কেউ আমাকে একটু শরবত বা সুরা দিতে পারে না। কেউ নেই এখানে?

জাহাজে আর কেউ নেই, ত্রিস্তান ছুটে এসে বললো, আমি দিচ্ছি। বিষম ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে ত্রিস্তান কিছুই পায় না। হঠাৎ চোখে পড়লো বিরজার সেই লুকানো কলসী। কি চমৎকার টলটলে আঙুরের মদ তার মধ্যে। একটা বড় গেলাসে ঢেলে রাজকুমারীকে দিল। সোনালী প্রথমে ইতস্তত করতে লাগলো। এই অকৃতজ্ঞ, বিবেকহীন লোকটার হাত থেকে নিয়ে তিনি পান করবেন? সোনালী মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

ত্রিস্তান অনুনয় করে বললেন, রাজকুমারী আমায় ক্ষমা করো। আমি সামান্য ভৃত্য, আমার হাত থেকে পান করতেই তোমার ঘৃণা?

তৃষ্ণায় রাজকুমারীর বুক ছট্‌ফট্ করছে। ত্রিস্তানের দিকে না তাকিয়ে অবহেলাভরে গ্লাসটা নিলেন। এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দিতেই ত্রিস্তান নিজে বাকিটুকু খেয়ে ফেললো। তারপর দুজনে সম্পূর্ণভাবে তাকালো দুজনের দিকে।

তারা কি পান করলো। এ তো সুরা নয়, এ যে তীব্র কামনা আর আনন্দ, এ যে অন্তহীন আকর্ষণ আর ছট্‌ফটানি। এ যে মৃত্যু।

সখী বিরজা ফিরে এসে দেখে, নিঃশব্দ দুটি পাথরের মূর্তি মতো ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে বসে আছে। যেন জোর করে ওদের কেউ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার নজর পড়লো সেই শূন্য কলসীর দিকে। হায় হায় করে উঠলো বিরজা। একি, এর আগে কেন আমার মনে হলো না। আমি কি পাপ করলুম। সখী সোনালী হতভাগ্য ত্রিস্তান, এ তোমরা কি কাজ করেছো। বিশ্বাসঘাতকতা। এ যে সর্বনেশে ভালোবাসা, এ যে মৃত্যু।

জাহাজ আবার চললো, কিন্তু ত্রিস্তান এখন অন্য মানুষ। ত্রিস্তানের মনে হলো তার রক্তের মধ্যে যেন শিকড় ছড়িয়েছে একটা ফুলগাছ, তার তীব্রগন্ধ-ফুল ফুটে উঠেছে তার শরীরে। এক মুহূর্ত তার শক্তি নেই, বারবার ছুটে যেতে ইচ্ছে আর একটা ফুলগাছের কাছে। যে ফুলগাছ রয়েছে সোনালীর শরীরে। ত্রিস্তান আর্তকণ্ঠে গুমরে উঠলো, ঠিকই বলেছিল সেই চারজন নাইট। আমি বিশ্বাসঘাতক। রাজা মার্ক তুমি অসহায় অবস্থায় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আজ আমি তোমার বিশ্বাসঘাতক। রাজা সোনালী তো তোমরাই, আমি তোমার, সে আমাকে ভালোবাসবে কেন।

কিন্তু কোথায় গেল সোনালীর ঘৃণা। তার সমস্ত রক্তে ত্রিস্তানের নাম। এ নাম যেন একটা নতুন সুর। সমুদ্র এই নাম বলে বাতাস এই নাম বলে, সোনালীর রক্ত এই নাম বলে। সুখ, দুঃখ, তুমি ত্রিস্তান, তুমিই আমর সুখ।

বিরজা দূর থেকে ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলো। দুদিন ত্রিস্তান বসে রইলো নিজের ঘরে। তৃতীয় দিন আর পারলো না, এগিয়ে এলো সোনালীর দিকে। সোনালী মাটিতে বসেছিলেন, ত্রিস্তানকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসো ত্রিস্তান, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি কেন আমাকে একা ফেলে রেখে কষ্ট দিচ্ছো?

–না, না, তুমি রানী, তুমি অমন করে আমাকে ডেকো না। তুমি আমার প্রভুপত্নী, আমি তোমাদের অনুচর মাত্র।

–আমি আর কিছুই জানি না ত্রিস্তান, তুমিই আমার প্রভু, আমি তোমার দাসী। ওঃ মুমূর্ষু বীণাবাদক হয়ে যেদিন এসেছিলে, সেদিন তোমার ক্ষত স্থানে কেন আমি ঔষধের বদলে বিষ দেইনি। ড্রাগনকে মারার পর যখন ঝোপের মধ্যে পড়েছিলে–কেন আমি তুলে এনেছিলাম। এখন যে আমার উপায় নেই। আমি যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি।

– কিসের যন্ত্রণা তোমার রানী?

– জানি না। জানি না। আকাশ আমায় যন্ত্রণা দিচ্ছে। সমুদ্র আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমার শরীর, আমার জীবন আমাকে যন্ত্রণায় পুড়িয়ে মারছে।

সোনালী কাছে এগিয়ে ত্রিস্তানের দুই কাঁধে হাত রাখলেন। তাঁর শরীর, তাঁর চোখ, কণ্ঠ থরথর করে কাঁপছে। ত্রিস্তান আবার জিগ্যেস করলো মৃদুস্বরে, কি তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, রানী?

–তুমি! তুমি! আমার ভালবাসা! তুমি আমাকে বাঁচাও।

ত্রিস্তান তুমি! আমার ভালবাসা! তুমি আমাকে বাঁচাও! ত্রিস্তান সোনালীর ওষ্ঠে ও ছোঁয়ালো। দু'জনে গভীরভাবে তাকালো দুজনের দিকে। তারপর পূর্ণ আলিঙ্গন করে দুজা ডুবিয়ে দিল দুজনের ওষ্ঠাধর।

বিরজা হাত বাড়িয়ে ছুটে এসে বললো, থামো, থামো, এখনও থামো। এ কোন সর্বনাশের পথে চলেছো, আর যে ফিরতে পারবে না। এ ভালোবাসা যে তোমাদের দুঃখ দিয়ে মারবে! ত্রিস্তান এখনও সরে যাও, অনেক দুঃখ সইতে হবে তোমায়।

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, দুঃখে আমার ভয় নেই! আমার নাম দুঃখ, আমার জন্ম দুঃখের দিনে, দুঃখকে আমার ভয় নেই।

–কিন্তু এ দুঃখ যে তোমাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে।

– তবে আসুক মৃত্যু

একথা বলে ত্রিস্তান সোনালীকে আবার চুম্বন করলো। তারপর মাটিতে বসে পড়ে সোনালীর পায়ে চুমু খেলো। সোনালী দ্রুত পা সরিয়ে নিয়ে ত্রিস্তানের করতলে তার চম্পক বর্ণ মুখখানি ঢাকলেন। ত্রিস্তানের শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, আমি জানতাম, তুমি আমার নিয়তি। পাশেই সোনালীর বিছানা। সেদিকে তাকিয়ে ত্রিস্তানে সোনালীকে বললো, এসো! সোনালী নিজেই হাত ধরে ত্রিস্তানকে নিয়ে এলেন বিছানায়। তারপর দৃঢ়ভাবে ত্রিস্তানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমরা দুজন দুজনের জন্য মরবো। এসো আমরা আজ সেই মৃত্যুকে ভোগ করি।

## ।। পাঁচ ।।

সমুদ্র পাড়ে রাজা মার্ক এসেছেন রানীকে অভ্যর্থনা জানাতে। পাশে নগর–সুদ্ধু লোক। ত্রিস্তান রাজকন্যার হাত ধরে জাহাজ থেকে নামলো। তারপর সেই হাত সঁপে দিল রাজার হাতে। রাজা মার্ক বললেন, ধন্য সেই দোয়েল পাখি, যে আমাকে তোমার সোনালী চুল এনে দিয়েছিল। সেই চুল দেখে আমি তোমার সৌন্দর্য কল্পনা করেছিলুম! কিন্তু আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছো তুমি। আর ত্রিস্তান, তুমিও ধন্য। ধন্য তোমার সাহস আর বীরত্ব!

নগরবাসীরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। মহাসমারোহে রাজকুমারীকে নিয়ে আসা হলো টিন্টাজেল দুর্গে।

আঠারো দিনের দিন রাজা সোনালীকে বিয়ে করলেন। সে কি আনন্দ, সে কি উৎসব, সে কি প্রাচুর্য! শুধু তিনজনের মনে আনন্দ নেই ত্রিস্তান আর সোনালী ছাড়াও আনন্দ নেই বিরজার চোখে। ভয়ে তার বুক দুরুদুরু করছে। আজ ফুলশয্যার সময় রাজা যখন দেখবেন, তার নতুন রানী কুমারী নয়, তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে, তখন কে বাঁচাবে রাজার ক্রোধ থেকে? রাজা তো সবাইকে মেরে ফেলবেন সেই মুহূর্তে! বিরজা সোনালীর সঙ্গে এক পরামর্শ করলো। ফুলশয্যার রাত্রে সব উৎসবের শেষে যখন রাজার ঘরে আলো নিভে যাবে, তখন সোনালী একবার বেড়িয়ে আসবেন ঘর থেকে– কোন এক ছুতোয়, তারপর বিরজা নিজেই ঢুকবেন সোনালীর পোশাক পরে অন্ধকারে বিরজার সঙ্গে সোনালীর তফাত বোঝা যাবেনা।

ঠিক সেই রকমই হলো। হুজুর আপনারা ভেবে দেখুন বিরজার আত্মত্যাগের মহত্ত্ব। নিজের সখীর সম্মান রাখার জন্য বিরজা সেদিন নিজের কুমারীত্ব বিসর্জন দিল রাজার কাছে।

তাপর থেকে রাজকুমারী সোনালী হলেন রানী সোনালী। রাজ্যের সবাই তাকে ভালোবাসে। রাজা মার্ক তাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসেন। রাজা কত মণিমুক্তা, কত অলংকার দিলেন তাঁকে। নানান দেশ থেকে এলো দুষ্প্রাপ্য আভরণ। কিন্তু রানীর মনে শুধু

এক চিন্তা কখন ত্রিস্তান কাছে আসবে। অলংকার, বস্ত্র, সুগন্ধি কিছুর প্রতিই তাঁর ভালোবাসা নেই, সব ভালোবাসা শুধু ত্রিস্তানের জন্য। দেখা হয় দুজনে গোপনে। ত্রিস্তান আগের মতোই শোয় রাজার পাশের ঘরে। মাঝরাত্রে ঘুমন্ত রাজার পাশ থেকে সোনালী উঠে আসে ত্রিস্তানের কাছে। দুজনে তখন বিশ্বসংসার ভুলে যায়। ভুলে যায় পাপ–পূণ্য, ভুলে যায় জীবন–মৃত্যুর কথা। দোষ কিংবা গুণ–আপনারা যাই বলুন, ভালোবাসা এই রকমই, সে আর সব কিছুকে আড়াল করে দেয়।

কিন্তু সব সময়েই দুজনের ভয়। কে কখন দেখে ফেলে। ভয়, অথচ দুজনে না মিলিত হয়েও পারে না। ওদের মৃত্যুভয় নেই, ওদের শুধু আর দেখা না হাবার ভয়! মরবে জেনেও চুম্বকের পাহাড়ের গায়ে জাহাজ যেমন ধাক্কা মারে, ওরা সেই রকম ছুটে আসে দুজনে। আর সখী বিরজা সব সময় ওদের পাহারা দেয়। একমাত্র সে জানে ওদের গোপন মিলনের খবর।

কিন্তু ভালোবাসা কি গোপন থাকে? এই উন্মাদ দুর্দান্ত ভালোবাসা যে মারী গুটিকার মতো সারা শরীরে ফুটে বেরোয়। ভালোবাসা যেন এক বিশাল বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর। ওদের দেহ এই ভালোবাসার আক্রমনে ছিন্নভিন্ন। ভালোবাসা আলোর মতো শরীর ফুঁড়ে বেরোয়। ওদের শরীরে সেই ভালোবাসার দীপ। গোপন প্রেম, সে তো প্রেমিক–প্রেমিকার প্রতি কথাবার্তা; হাঁটা চলা থেকেই ফুটে বেরোয়। তীব্র সুধার মতো ভালোবাসা মিশেছে ওদের শোনিতে, ওদের নেশাগ্রস্থের মতো দেখাবে না! কেউ ওদের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখে ফেলেনি, তবু লোকে ওদের সন্দেহ করতে লাগলো। যেন ওদের দু'জনেরই শরীরে গোপন প্রেমের গন্ধ!

অন্তত সেই চারজন হিংসুটে নাইট। তারা তীব্র ঈর্ষা আর ক্রোধে জ্বলতে লাগলো। একদিন রাজাকে বলেই ফেললো, মহারাজ, আপনি ত্রিস্তানকে বড় বেশী বিশ্বাস করেছেন। ও আপনার সর্বনাশ করবে। এখনো ওকে সরান। ও কি রানীকে জয় করে আনলো শুধু শুধু? লোকে যে এই নিয়ে নানা কথা বলছে। মহারাজ, ওকে বিশ্বাস করবেন না। আমরা জানি, ও রানীর প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছে।

শুনে রাজা ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন। ভীরু কাপুরুষের দল! ত্রিস্তানকে বিশ্বাস করবো না তো কাকে বিশ্বাস করবো? যেদিন দানব মোরহল্ট এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল–সেদিন তোমাদের মুখ কোথায় ছিল! সেদিন কে বাঁচিয়েছিল এ দেশের সম্মান? তোমারা তাকে হিংসে করো? কি শুনেছো, কি দেখেছো তোমরা ত্রিস্তানের অবিশ্বাসের কাজ?

–কিছুই না। আপনিও চোখ খুললে, কান খুললে তা দেখতে পাবেন, শুনতে পাবেন। সময় থাকতে সাবধান হোন মহারাজ।

রাজা তাদের দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু কথাটা রয়ে গেল তার মনের মধ্যে। সব সময় খচ্‌খচ্ করতে লাগলো। বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল রাজার মধ্যে। ঈর্ষা জিনিসটা এমন তা যে কি অলম্বন করে কখন বেড়ে ওঠে কেউ জানে না। ত্রিস্তানকে সন্দেহ করতে রাজার নিজেরই মন ছি–ছি করে উঠে। আর, ঐ ফুলের মতো পবিত্র রানী, তাকে কখনও সন্দেহ করা যায়? তবু রাজার মন ঘুরে ফিরে ও কথাই ভাবে। তাঁর মনের মধ্যে কাঁটা গেঁথে গেল। রাজা গোপনে নজর রাখতে লাগলেন ওদের দুজনের ওপর। বিরজা কিন্তু রাজার মনের অবস্থা টের পেয়ে ওদের সাবধান করে দিল।

রাজা একদিন ত্রিস্তানকে ডাকলেন। মুখ নিচু করে গম্ভীরভাবে বললেন, ত্রিস্তান, তুমি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাও। আমি কোন কারণ দেখাতে পারবো না। তোমাকে বিদায় দিতে

বুক ফেটে যায়। কিন্তু নিন্দুকেরা তোমার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলছে। সে এমন কথা, যা আমি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারবো না। আমি জানি সে কথা মিথ্যে। তবু আমার মনে সে কথা গেঁথে যাচ্ছে। তুমি যাও। আমার মন শান্ত হলে আবার তোমাকে ডাকবো। তুমি যাও। ত্রিস্তান, আমায় ক্ষমা করো। তুমি এখনো আমার প্রাণের মতো প্রিয়।

ত্রিস্তান একটি কথাও না বলে বেরিয়ে এলো! কিন্তু কতদূর যাবে? চুম্বকের পাহাড়ের সঙ্গে যে সে বাঁধা! শহরে ছেড়ে একটু বাইরে সে গুরু গরভেনালের সঙ্গে একটা ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে রইলো। কয়েকদিন পরই পড়লো অসুখে। গুরু গরভেনাল অনেক সেবা করলেন। কিন্তু এ অসুখ সারবে কিসে! শায়িত ত্রিস্তানের আত্মা বারবার উড়ে গিয়ে আঘাত করতে লাগলো দূর্গের দরজায়।

ওদিকে রানীর অসুখ। কিন্তু এ অসুখ আরও মারাত্মক। রানীকে বাইরে অসুখী থাকলে চলে না, মুখে হাসি ফোটাতে হয়। প্রতিদিন শুতে হয় রাজার সঙ্গে এক শয্যায়। তিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছেন ত্রিস্তানের কাছে। প্রহরীরা তার ডানা কেটে দিল। সমস্ত রাজপুরীতে রানীর রক্ত। সে রক্ত চোখে দেখা যায় না।

প্রেমিক-প্রেমিকা দুজন হয়তো মরেই যেতো। কিন্তু সখী বিরজা উপায় বার করলো। সে খুঁজতে খুঁজতে এলো ত্রিস্তানের বাড়িতে। এবং গোপন মিলনের পথ বলে দিল।

দূর্গের পিছন দিকে বাগানের শেষ প্রান্তে নানা রঙের ফুলগাছ আর আঙুর লতার ঝোপ। একটা লম্বা পাইন গাছ সেখানে দাঁড়িয়ে। তার নিচ দিয়ে ঝরনা চলে এসেছে। সেই ঝরনাটা বয়ে এসেছে একেবারে রাজপুরীর মধ্যে রানীর স্নানের ঘরে। ত্রিস্তান রাত্রিবেলা লুকিয়ে সেই ফুলগাছের ঝোপে দাঁড়িয়ে ঝরনার জলে একটা গোলাপ ফুল ফেলে দেবে। ফুলটা ভাসতে ভাসতে রানীর স্নানের ঘরে গেলে, রানী বুঝতে পারবেন ত্রিস্তানের সঙ্কেত। তখন তিনিও চুপিচুপি বেরিয়ে আসবেন বাগানে পাইন গাছের নিচে।

প্রত্যেক সন্ধেবেলা ত্রিস্তান গিয়ে সেই ঝোপে লুকিয়ে ঝরনার জলে গোলাপ ফুল ফেলে দেয়। রাজা তখন রাজকার্যে ব্যস্ত। রানী সোনালী গোপনে এসে মিলিত হন। রানীর আসার সময় প্রতি মুহূর্তে ভয়, প্রতি মুহূর্তে সতর্কতা। তারপর একবার ত্রিস্তানের আলিঙ্গনের মধ্যে এলে আর কোনো ভয় থাকে না। সেই আলিঙ্গনের মধ্যেই যে সমস্ত বিশ্ব।

একদিন রাত্রের সোনালী বললেন, ত্রিস্তান, আমরা কোথায় বসে আছি? আমি গল্প শুনেছি এই দুর্গটা পরীরা তৈরী করেছে। বছরে দুবার এই দুর্গটা অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ সেই অদৃশ্য হবার দিন। আজ দুর্গ নেই, প্রহরী নেই, রাজা নেই, নেই কোনো সতর্ক চোখ। আমরা বসে আছি এক মায়া কাননে, এই গাছ এই ফুলের গন্ধ, এই জ্যোৎস্না-সবাই আমাদের বন্ধু। আজ আমরা এখানে সরারাত থাকবো।

ঠিক তখনই দুর্গের ফটকে ন'টার ঘন্টা বাজলো।

ত্রিস্তান বললো, না সোনালী, এ সেই মায়া কানন নয়, এ দুর্গ অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তবে, একদিন আমরা এক অপরূপ দেশে যাবো, যেখান থেকে কেউ ফেরে না। সেখানে আছে এক সাদা পাথরের দুর্গ তার এক হাজারটা জানালার প্রত্যেকটিতে আলো জ্বলে, প্রত্যেক ঘরে সুর ভেসে বেড়ায়, সেখানে সূর্য উঠে না কিন্তু আলোর অভাবে কেউ অনুতাপ করে না। সেই চিরসুখের দেশে একদিন আমরা চলে যাবো, চিরকাল থাকবো এক সঙ্গে। এখন এক নিষ্ঠুর, বাস্তব দুর্গে তুমি ফিরে যাও।

সোনালী ফিরে পেয়েছেন তার আনন্দ। রাজা মার্কের মন থেকে মুছে গেছে সন্দেহের কুয়াশা। কিন্তু সেই হিংসুকরা নিবৃত্ত হয়নি। রানীকে দেখে তখনও তাদের সন্দেহ হয়। এখনও কেন রানীর সর্ব অঙ্গে শিহরণ? অথচ কিছুই ধরতে পারছে না!

তখন তারা একজন গণৎকারের কাছে গেল। এই গণৎকারটি মাটিতে খড়ির দাগ কেটে অনেক কিছু বলতে পারে। লোকটা দেখতে যেমন কুৎসিত তেমনি লোভী। সব শুনে সেই লোকটা আনন্দে নেচে উঠলো। সে কুৎসিত বলেই কোনো সুন্দর জিনিস সহ্য করতে পারে না। ত্রিস্তান আর সোনালীর প্রেমের কথা শুনে সে খলখল করে হেসে উঠলো। ওর নিজেরই গরজ হলো ওদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেবার। সে খড়ির দাগ কেটে বললো, আপনারা আজই তো ওদের ধরতে পারবেন।

সকলে মিলে এলো রাজার কাছে। বললো, মহারাজ, এবার হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি, ত্রিস্তান কতখানি অবিশ্বাসী। আপনি আজই ঘোষণা করে দিন, সাতদিনের জন্য আপনি শিকারে যাচ্ছেন। সেই মতো সৈন্যসামন্ত শিকারের সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। তারপর একা গোপনে ফিরে এসে, আপনি লুকিয়ে উঠে বসে থাকুন বাগানের উঁচু পাইন গাছে। দেখবেন, সেখানে ওদের কান্ড –কারখানা।

শুনে রাজার ঘৃণা হলো ওদের কথায়। কিন্তু উড়িয়ে দিতেও পারলেন না। প্রেমে ঈর্ষা এমনই আশ্চর্য বস্তু, যে তা পরম মহৎ লোকেরও হৃদয় কুরে খেতে পারে। রাজা মুখে বললেন, তোমরা দূর হয়ে যাও, কুকুরের দল! কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা, গোপনে রাজা উঠে বসে রইলেন পাইন গাছে।

সেই রাতে জ্যোৎস্নায় চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। দিনের আলোর মতো ফটফট্ করছে জ্যোৎস্না। ত্রিস্তান পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে এলো ঝোপের মধ্যে। তারপর নিচু হয়ে ঝরনার জলে গোলাপ ফুল ফেলে দিলো। কিন্তু ফুলটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ঝরনার জলে দেখলো মানুষের ছায়া, ছায়ার মাথায় রাজমুকুট। ত্রিস্তান ভয়ে কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারলো, গাছের ওপর বসা কার ছায়া পড়েছে জলে। কিন্তু ততক্ষণে ফুল ভেসে গেছে। সোনালীকে যে আর ফেরাবার উপায় নেই। ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুন।

তখন আর ত্রিস্তানের পালাবারও উপায় নেই! কারণ রানী তো আসবেনই। দূর থেকে দেখা গেল রানী আসছেন। ত্রিস্তান পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। একটুও সাড়া–শব্দ করলো না, হাত তুলে ইশারা করলো না। রানী ভাবলেন, আজ কি হলো ত্রিস্তানের, সে তো আমার দিকে ছুটে আসছে না। তবে কি ওর শরীর অসুস্থ? অথবা কোনো শত্রুকে দেখতে পেয়েছে? রানী একটু দূরে থমকে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে রইলো ত্রিস্তানের দিকে। তবু ত্রিস্তানের শরীর নিস্পন্দ। এবার রানী জিগ্যেস করলেন, কে ওখানে? কোনো সাড়া এলো না। এবার স্পষ্ট সন্দেহ করে, রানী সোনালী অনুচ্চ স্বরে বললেন, তুমি যদি ত্রিস্তান হও, তবে তুমি কোন্ সাহসে এত রাত্তিরে আমাকে ডেকেছো? তুমি অনেকেবার আমাকে ডেকেছো, আমি আসিনি। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আছে। বলো, তুমি কি বলতে চাও আজ?

রানীর কথা শুনে ত্রিস্তান মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। একটু আগেই সে শুনেছে গাছের ওপর খুব মৃদু একটা শব্দ। অর্থাৎ রাজা ধনুকে বাণ পরিয়েছেন। যে কোনো

মুহূর্তে বাণ এসে বুকে বিঁধতে পারে। কিন্তু ভয় পেল না সে। করুণ গলায় ত্রিস্তান বললো, রানী, আপনি একবার আমার হয়ে রাজাকে অনুরোধ করুন। আপনাকে এই জন্যই বারবার খবর পাঠিয়েছি, আপনি আসেননি। কিন্তু, আপনি আমাকে দয়া করুন। রাজা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি জানি না কেন? কিন্তু রাজাকে ছেড়ে থাকতে আমার মন কাঁদে। রানী, আপনার দয়ার প্রাণ, আপনি আমার হয়ে রাজাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমার কি দোষ?

কান্নায় তখন সোনালীর শরীর কাঁপছে। তবু তিনি সখেদ গলায় বললেন, ত্রিস্তান, এ কি দুর্বুদ্ধি তোমার! এ কি প্রার্থনা জানাবার সময়! আমি জানি তুমি নির্দোষ! কিন্তু রাজা তোমাকে সন্দেহ করেন—সে যে কি সন্দেহ আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না! রাজা হয়তো আমাকেও সন্দেহ করেন, ঈশ্বর সাক্ষী আছেন, কুমারী অবস্থায় যার বাহুতে আমি প্রথম ধরা দিয়েছি তাকে ছাড়া আর কারুকে আমি ভালোবাসি না! তোমার জন্য রাজার কাছে দয়া ভিক্ষা করলে যে রাজা আমাকে আরো সন্দেহ করবেন! বিশেষত, এত রাত্রে আমি তোমার কাছে এসেছি, তিনি জানতে পারলে, আমাকে পুড়িয়ে তিনি আমার ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেবেন।

ত্রিস্তান যেন আরও ভেঙে পড়ে বললো, রাজা, তুমি কেন আমায় সন্দেহ করলে? আমার অপরাধের কি প্রমাণ পেয়েছো তুমি?

রানী বললেন, না ত্রিস্তান, রাজা মার্ক উদার, তিনি নিজে থেকে এমন নীচ সন্দেহ করতেই পারেন না। দুষ্ট লোকেরা রাজার মন বিষিয়ে দিয়েছে। রাজা তো এমন ছিলেন না। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছি না, আমি যাই। ত্রিস্তান তোমার দুর্ভাগ্য, মিথ্যে সন্দেহে রাজা তোমার মতো বন্ধুকে ত্যাগ করলেন। রাজারও দুর্ভাগ্য!

—তবে তাই হোক, আমি এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো। রানী, আপনি শুধু রাজাকে বলুন, যেন আমি সসম্মানে চলে যেতে পারি। যাবার আগে রাজা যেন আমাকে তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে বিদায় করেন। নইলে দেশ-বিদেশে যে আমার নামে কলঙ্ক রটে যাবে।

—না ত্রিস্তান, আমি কোনো অনুরোধই করতে পারবো না তোমার হয়ে। যদি রাজার কাছে তোমার নাম উচ্চারণ করলেই তিনি রেগে ওঠেন? এ দেশে আমি একা, রাজা ছাড়া আর কারুকে আমি নির্ভর করতে পারি না। তিনি নির্দয় হলেও আমাকে তা সহ্য করতে হবে। তুমি যাও ত্রিস্তান, একাই চলে যাও এ রাজ্য ছেড়ে গোপনে। রাজা তোমাকে ক্ষমা না করলেও ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করবেন।

এই কথা বলে রানী ফিরে গেলেন। ত্রিস্তান আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, তাকিয়ে দেখলো, দূরে রানীর ঘরের জানালায় আলো জ্বলে উঠেছে। তখন ত্রিস্তান সরবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপন মনেই বললো, রাজা, আমি তোমার জন্যে বারবার জীবন বিপন্ন করেছি, আর তুমি তার এই প্রতিদান দিলে? আচ্ছা, আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ত্রিস্তান চলে যেতে রাজা গাছ থেকে নেমে এলেন। মৃদু হাস্য করে বললেন, কি সৌভাগ্য যে আজ এখানে এসেছিলাম। সব ভুল ভেঙ্গে গেল। না ত্রিস্তান, তোমার অন্য দেশে যাওয়া হবে না।

।। ছয় ।।

পরদিনই রাজা ত্রিস্তানকে ফিরিয়ে আনলেন দুর্গে। ত্রিস্তান আগের মতোই রাজা–রানীর শয়ন ঘরের পাশে জায়গা পেল। রাজার মন এখন মেঘমুক্ত আকাশের মতো সন্দেহহীন, ঈর্ষাহীন। ত্রিস্তান আর সোনালীর মধ্যে আবার নিয়মিত গোপনে দেখা হতে লাগলো। আবার ওদের ভালোবাসা উদ্দাম হয়ে উঠলো।

এবার রাজার মনে পড়লো সেই চারজন নাইট আর গণৎকারের কথা। ওদের শাস্তি দেবার জন্যে রাজা পাঁচজনকেই ডেকে পাঠালেন। সামনে আসতেই রাজা বললেন, এই পাজী গণৎকারটাকে ফাঁসি দেবো আর তোমাদের--

নাইটরা বললো, মহারাজ, আপনি আমাদের যতই ঘৃণা করুন, তবু আমরা বলবো ত্রিস্তান রানীকে ভালোবাসে, ওদের গোপন মিলন হয়। এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

গণৎকার বললো, রাজা আমাকে ফাঁসি দিন ক্ষতি নেই। কিন্তু, তবুও শেষ পর্যন্ত বলে যাবো, আমার গণনা কখনো মিথ্যা হয় না। আমার কথা মতো গিয়ে আপনি ওদের দেখতে পেয়েছিলেন কি না? আমি আবার বলছি, এখনও ওদের মিলন হয়।

রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলেন। ভাবলেন, আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু আমার প্রজাদের মুখ বন্ধ করি কি করে?

গণৎকার আবার বললেন, ফাঁসি দেবার আগে, মহারাজ, আমাকে আর একবার সুযোগ দিন! এবার হাতে হাতে ধরিয়ে দেবো।

মেঘগর্জনের স্বরে রাজা বললেন, যদি না পারো?

—তবে আমি নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবো। মহারাজ, আমার গণনা মিথ্যা হয়না।

—এই কুৎসিত গণৎকারটার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল, রাজা অবহেলা করতে পারলেন না।

তিনি বললেন, কি ব্যবস্থা তুমি করতে চাও?

—মহারাজ, আপনি ত্রিস্তানকে আজই ভোর রাতে কোনো দূর দেশে পাঠান কয়েক দিনের জন্য, কিছু একটা কাজের ভার দিয়ে। আদেশটা দেবেন আপনি রাত্তির বেলা। তারপর যা করার আমি করবো। হঠাৎ বাইরে যাবার কথা শুনলে, ত্রিস্তান সবার আগে একবার রানীর সঙ্গে দেখা না করে পারবে না!-

সেই রাত্রে রাজা শুতে যাবার আগে প্রতিদিনের মতো ত্রিস্তান এলো রাজার সামনে বীণা বাজাতে। রাজা বললেন, আজ আর গান ভালো লাগছে না। তাছাড়া, ত্রিস্তান, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে! তোমাকে একটা গোপন চিঠি নিয়ে যেতে হবে রাজা আর্থারের কাছে। তুমি ওখান থেকে উত্তর নিয়ে আসবে।

ত্রিস্তান বললো, আমি কালই রওনা হবো।

—কাল নয় আজই ভোর রাত্রে। খুব জরুরী চিঠি ত্রিস্তান, তোমাকে ছাড়া আর কারু হাতে দিতে পারি না! এখন বরং খানিকটা ঘুমিয়ে নাও।

ত্রিস্তান শুতে গেল। রাজা গেলেন নিজের ঘরে অথচ ত্রিস্তানের বুকে একটা অসম্ভব ইচ্ছে ঝাপটা মারছে। সাত দিন অন্তত বাইরে থাকতে হবে, যাবার আগে একবার রানীর

সঙ্গে দেখা হবে না? একবার না দেখলে—সারাটা পথ যে ত্রিস্তানের বুক খাঁ খাঁ করবে। রোদ্দুর তাকে বেশি জ্বালা দেবে, শীত তাকে বেশি কষ্ট দেবে—পথ মনে হবে অনন্ত, যদি একবার যাবার আগে রানীর সঙ্গে দেখা না হয়।

রাজার চোখে ঘুম নেই, সারারাত তিনি জেগে। গণৎকারের পরিকল্পনা মতো গভীর রাতে রাজা একবার উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জাগ্রত ত্রিস্তান তা লক্ষ্য করে ভাবলো, এই তো সুযোগ। নিমেষের জন্য একবার রানীর সঙ্গে দেখা করে আসা যায়। হঠাৎ ত্রিস্তান দেখলো, একটা বেঁটে মতো কুৎসিত লোক অন্ধকারের মধ্যে তার আর রাজার ঘরের মধ্যে যে বারান্দা সেখানে কি যেন ছড়াচ্ছে। এ সেই গণৎকার সারা বারান্দায় ময়দা ছড়িয়ে দিচ্ছে। ত্রিস্তান বা রাণী যে কেউ একজন ঘর থেকে বেরুলেই পায়ের ছাপ পড়ে যাবে। আর সেই পায়ের ছাপ বলে দেবে কে কোন দিকে গেছে। ত্রিস্তান অন্ধকারে শুয়ে সব লক্ষ্য করলো। মনে মনে হাসলো ঐ বামনটা ভেবেছে ঐ দিয়ে তাকে ধরবে? অন্য যে-কেউ হলে সে রাত্রে আর দেখা করার সাহস পেতো না। কিন্তু ত্রিস্তানের কথা আলাদা। সে আলাদা ধাতু। বিপদের গন্ধ পেয়েই যেন ত্রিস্তানের ইচ্ছা আরও উদ্দাম হয়ে উঠলো। গণৎকার চলে যেতেই ত্রিস্তান নিজের ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে এক লাফ দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে চলে গেল রানীর ঘরে। কোনো পায়ের ছাপ পড়লো না। তারপর ত্রিস্তান গিয়ে ঘুমন্ত রানীর মুখ চুম্বন করে তাকে জাগালো।

কিন্তু সেদিন সকালবেলা হরিণ শিকারে গিয়ে ত্রিস্তানের পায়ের গোড়ালির খানিকটা কেটে গিয়েছিল। এখন লাফাবার সময়ই সেই ক্ষত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়লো বারান্দায়। ত্রিস্তান টের পায়নি। ওদিকে রাজা গিয়ে মিলিত হলেন সেই চারজন অপেক্ষমান নাইটের সঙ্গে, একটু পরেই গণকঠাকুর কাজ সেরে এলো। তারপর মাটিতে খড়ির দাগ কেটে গুনতে গুনতে হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলো, এইবার এইবার এসেছে চলুন, এখনই গিয়ে ধরতে হবে।

উন্মুক্ত তরবারি হাতে নাইট চারজন ছুটে এলো রাজার সঙ্গে সঙ্গে। ওদের আসার শব্দ পেয়েই ত্রিস্তান একলাফে ফিরে গেছে নিজের ঘরে। আবার ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়লো বারান্দায়। ত্রিস্তান জানে কোনো পায়ের ছাপ পড়েনি। সে মনে মনে হেসে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো।

রাজা এসে দেখলেন রক্তের দাগ। নাইট চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরলো নিরস্ত্র ত্রিস্তানকে। তারপর বললো, এই দেখুন মহারাজ, ওর পায়ের কাটা ঘা, ওখান থেকে রক্ত পড়েছে। ময়দার উপর দু'সারি রক্তের দাগ—তার মানে একবার এসেছে একবার গেছে। কি সাহস—আপনি একটু বেরিয়েছেন তার মধ্যেই। আর ঐ যে ও ঘরে আপনার রানী পড়ে আছেন ঘুমের ভান করে, মনে হয় যেন সতী সাধ্বী, কিন্তু ওঁর পাপও সমান সমান।

রাজা ঘৃণায় মুখ নিচু করলেন। ত্রিস্তান শুধু বললো, না, রানীর কোনো দোষ নেই।

রাজা গভীর বিষাদের স্বরে বললেন, ত্রিস্তান, আর আমার সন্দেহ রইলো না। আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলুম, সেই বিশ্বাসের এই মুল্য দিলে তুমি? তুমি আমার প্রিয় ভগিনী শ্বেতপুষ্পার ছেলে—কিন্তু তোমার মুখ দেখতেও আজ আমার ঘৃণা হচ্ছে। কাল সকাল বেলাতেই তোমাকে মরতে হবে।

ত্রিস্তান কাতরভাবে বলে উঠলো—মহারাজ দয়া করুন। দয়া—

—তোমার দয়ার কথা বলতে লজ্জা হয় না ত্রিস্তান?

আমার জন্য দয়া নয়। আমি কি মরতে ভয় করি? তাহলে কি এই চারটে কাপুরুষকে আমার গায়ে হাত ছোঁয়াতে দিতাম? আমার জন্য দয়া নয়, রানীকে দয়া করুন। ওঁর কোনো পাপ নেই। এরা যে আমার নাম জড়িয়ে রানীকে অপবাদ দিতে চায়—আমি এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজী আছি। কিন্তু রানীর নামে এই কলঙ্ক বাইরে ছড়াবেন না।

রাজা দু'হাতে মুখ ঢেকে বললেন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি তাকাতে পারছি না এই অকৃতজ্ঞ পশুটার মুখের দিকে। ও! কে কোথায় আছো, বেঁধে রাখো ওকে।

ত্রিস্তানকে হাত পা বেঁধে রেখে ওরা চলে গেল। রানীরও নরম শরীর বাঁধলো শক্ত দড়ি দিয়ে। কাল সকালে ওদের দুজনেরই শাস্তি হবে।

ধরা পড়েও ত্রিস্তান বেশি ভয় পায়নি। কারণ, আপনারা তো জানেন, সেকালে নিয়ম ছিল কোনো নাইটের নামে কেউ কোনো অভিযোগ আনলে, দুজনে রাজার সামনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে সেটা মিটিয়ে নিত। যুদ্ধে যে হারে সে-ই দোষী। ত্রিস্তান জানতো, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস হবে—এমন লোক সে রাজ্যে একজনও নেই। কিন্তু হায়, সে জানতো না—পরের দিন বিনা বিচারেই তার মৃত্যুদণ্ড হবে। যদি জানতো, তবে কি সে ঐ কাপুরুষ চারজন নাইটের হাতে ধরা দিত? নিরস্ত্র অবস্থাতেও সে ওদের হত্যা করতে পারতো। হায় ত্রিস্তান! হায় সোনালী! দুজনে পড়ে রইলো দু'ঘরে হাত পা বাঁধা।

## ।। সাত ।।

রাত্রির অন্ধকার থাকতেই ছড়িয়ে পড়লো ত্রিস্তান আর সোনালীর কলঙ্কের কথা। লোকে শুনলো রাজা ওদের দুজনকেই প্রকাশ্যে ফাঁসি দিবেন। দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগলো রাজপুরীর দিকে। একি ভয়ানক কথা।

লোকেরা চেঁচিয়ে বিলাপ করতে লাগলো ওদের নাম করে হায় ত্রিস্তান? আমাদের দেশের গর্ব তুমি, তোমাকে মরতে হবে এমন অপমানে, লজ্জায়? হায় রানী সোনালী, তোমার সৌন্দর্য চিরকাল আমাদের দেশে প্রবাদ হয়ে থাকবে, পৃথিবীতে যে কেউ কখনো সুন্দরী মেয়ে দেখলে তোমার সঙ্গে তুলনা করবে—আর আজ তোমাকে আমরা চোখের সামনে মরতে দেখবো? তোমাদের নামে এ কলঙ্ক কি সত্যি? নাকি ঐ বদমাস গণৎকার ঠাকুরের কারসাজী সব? জাদুবিদ্যার প্রহেলিকা! মহারাজ, আপনি আগে ওদের প্রকাশ্যে বিচার করুন। আগে মারবেন না।

ভোরের আলো ফুটতেই রাজা মার্ক বেরিয়ে এসে রথে উঠলেন। সোজা চলে এলেন বধ্যভূমিতে। তাঁর মুখ গনগন করছে। হুকুম দিলেন, দুটো বিশাল গর্ত খোঁড়ো। তাঁর সামনে দুটো দণ্ড পুঁতে দাও। ফাঁসি নয়, আমি ঠিক করেছি ঐ শয়তান শয়তানীকে আমি পুড়িয়ে মারবো। ফাঁসিতে আর কতখানি সাজা হবে?

জনতা চেঁচিয়ে উঠলো, মহারাজ, আগে বিচার হোক! আগে বিচার। আগে ওদের মুখের কথা শুনুন! বিনা বিচারে হত্যা করা যে মহাপাপ! মহারাজ, আপনি ন্যায়পরায়ণ, আপনি—

রাজা মার্ক ধমকে উঠলেন, না, কোনো বিচার নয়, বিচার আমি মনে মনেই শেষ করেছি। আমি আর একমুহূর্তও ওদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই না। কে আপত্তি করছে, দেখি এগিয়ে এসো সামনে।

কেউ এলো না ভয়ে।

রাজা প্রহরীদের বললেন, যাও, ওদের নিয়ে এসো।

প্রহরীরা ছুটে গেল। একদল টানতে টানতে সোনালীর সামনে দিয়ে নিতে এলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ত্রিস্তানকে। সোনালী শান্ত স্বরে বললেন, ত্রিস্তান, আবার দেখা হবে। স্বর্গ অথবা নরক কোথায় আমরা যাবো জানি না। কিন্তু আবার দেখা হবে। ত্রিস্তান বললো, সোনালী, আবার ঠিক দেখা হবে।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগলো ত্রিস্তানকে, এমন সময় দূরে একজন অশ্বারোহীকে আসতে দেখা গেল। দিনাস নামে এক জমিদার, তিনি বরাবরই ত্রিস্তানকে ভালোবাসতেন। দিনাস এত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছেন যে, ঘোড়ার মুখ ফেনায় ভরে গেছে। দিনাস বললেন, ত্রিস্তান, আমি খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। একি অসম্ভব কথা। না, তোমাদের এভাবে মরা অসম্ভব। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

তারপর দিনাস প্রহরীদের দিকে ফিরে বললেন, হতভাগ্যরা, তোরা ওকে অমনভাবে শিকল দিয়ে বেঁধেছিস, একটু বিবেক নেই তোদের? কে তোদের রাজ্য বাঁচিয়েছে? খুলে দে শিকল! যদি ত্রিস্তান পালাবার চেষ্টা করে তোদের হাতে তলোয়ার নেই? ও একা নিরস্ত্র, আর তোরা দশজন। খুলে দে।

প্রহরীরা লজ্জায় শিকল খুলে দিলো! কিন্তু হাতে তলোয়ার নিয়ে তারা ঘিরে রইলো ত্রিস্তানকে। দিনাস ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

**এবার শুনুন হুজুর, ঈশ্বরের করুণার কথা। আপনারা জ্ঞানী গুণী, আপনাদের কিছুই অজানা নেই। আপনারা জানেন, যে পাপ করে সে রাজার হাত এড়িয়ে পালালেও ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেন! আবার যে পাপ করে না, সে রাজার হাতে ধরা পড়লেও ঈশ্বর তাকে বাঁচান। ভালবাসা কি পাপ? তাহলে পৃথিবীতে পূণ্য বলে কিছু নেই। ভালবাসা যদি পাপ হয়, তবে গান গাওয়াও পাপ, ঈশ্বরকে পূজা করাও পাপ। প্রেমিককে যদি ঈশ্বর না রক্ষা করেন, তাহলে বুঝতে হবে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর ত্রিস্তানকে রক্ষা করলেন।**

পাহাড়ী রাস্তায় যেতে একটা চূড়ার উপর ছোট্ট একটা গির্জা। তার একপাশে এই রাস্তা, আর একপাশে খাড়া পাড়ের খাদ, একেবারে নেমে গেছে সমুদ্র পর্যন্ত। ত্রিস্তান সেখানে এসে বললো, প্রহরী আমি এই গির্জায় ঢুকে শেষবারের মতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চাই। কিন্তু আমি একা যাবো। আমার তো পালাবার পথ নেই, একটাই তো দরজা, সেখানে তোমরা পাহাড়া দেবে।

প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাজী হয়ে গেল। ত্রিস্তান ছিল তাদের রাজ্যের চোখের মণি। আজ তাকে সামান্য কয়েদীর মতো বেঁধে নিয়ে যেতে হচ্ছে। সসম্ভ্রমেই তারা ত্রিস্তানকে গির্জার মধ্যে যেতে দিলো। ত্রিস্তান গির্জায় ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠলো গির্জার জানালায়। কাঁধের চাড় দিয়ে বেকিয়ে ফেললো শক্ত লোহার শিক। সেখানে দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান দেখলো বহু নিচে সমুদ্রের পাড়। এখান থেকে লাফালে নিশ্চিত মৃত্যু। ত্রিস্তান বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে সেই দেড় হাজার ফুট নিচের সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো। ওখান থেকে কোনো জীবন্ত মানুষ সজ্ঞানে লাফাতে পারে না। অসম্ভব! আজ পর্যন্ত কর্নওয়ালের লোক ঐ জায়গাটাকে বলে ত্রিস্তানের লাফ।

ত্রিস্তান মরতেই চেয়েছিল। সাধারণ চোর-ডাকাতের মতো সকলের সামনে মরার চেয়ে সে নিজেই মরতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পরনে ছিল আঙরাখা, বাতাসে সেটা ফুলিয়ে তার পড়ার গতি কমিয়ে দিল। সে ঝুপ করে গিয়ে পড়লো সমুদ্রে। পতনের বেগে সমুদ্রের অনেক

নিচে ডুবে গেল সে, কিন্তু বুকভরা নিশ্বাস ছিল বলে ভেসে উঠতে খুব অসুবিধে হলো না। তাড়াতাড়ি সাঁতরে এসে পাড়ে উঠলো।

এদিকে গুরু গরভেনাল ত্রিস্তানের বন্দী-দশার কথা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন যথাসর্বস্ব নিয়ে। ত্রিস্তানের ওপর রাগে, রাজাও তাঁকে হত্যা করবে নিশ্চিত। ঘোড়া ছুটে পালাতে পালাতে গরভেনাল দেখলেন বালির উপর দিয়ে পাগলের মতো একটা লোক ছুটছে। কাছে এসে দেখলেন ত্রিস্তান। গরভেনালকে দেখেও গ্রাহ্য করলো না। তখনো ছুটতে লাগলো। গরভেনাল জামা ধরে বললেন, কোথায় যাচ্ছো ত্রিস্তান?

উন্মত্তের মতো ত্রিস্তান বললো, আমায় ছেড়ে দিন, আমার আর সময় নেই। গুরুদেব, আমি মরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেঁচে গেলাম। কিন্তু কেন বাঁচলাম? সোনালীকে যদি ওরা মেরে ফেলে, তবে আমার বেঁচে লাভ কি? গুরুদেব, আমাকে ছাড়ুন, আমি যাই আমি একা খালি হাতেই ওদের ধ্বংস করে দেবো। ওরা পারবে না সোনালীকে মারতে! পারবে না।

গরভেনাল ঘোড়া থেকে নেমে ত্রিস্তানকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ত্রিস্তান তুমি কি সত্যি পাগল হলে? তোমার যতই শক্তি থাক, তুমি একা কি করবে! ওখানে রাজার হাজার সৈন্য। তোমার বর্ম তলোয়ার সব এনেছি আমি, তবু তুমি একা যুদ্ধ করে পারবে না। এসো বরং আমরা একধারে লুকিয়ে বসে থাকি।

—কি হবে চুপ করে বসে থেকে?

—পথ দিয়ে কত মানুষ যাচ্ছে, তাদের কথা শুনে আমরা সব ঘটনা জানতে পারবো।

—সোনালীকে যদি মেরেই ফেলে, তবে আমরা আর কি করবো!

—তুমি পালিয়েছো শুনে রাজা সোনালীকে হয়তো আজই নাও মারতে পারেন। যদি সত্যিই মেরে ফেলেন, তাহলে ত্রিস্তান, যীশুর নামে, মা মেরীর নামে শপথ করছি আমরা দুজন এই রাজ্য ছারখার করে দেবো। যতক্ষণ আমাদের হাতে তলোয়ার থাকবে সোনালীর মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে থামবো না। প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষত্রিয় কখনো মরতে চায় না! কিন্তু আগে দেখি, হয়তো ওরা সোনালীকে মারবে না।

অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে ত্রিস্তান গরভেনালের সঙ্গে পথের পাশে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রইলো।

ত্রিস্তানের পলায়নের খবর শুনে রাজা জ্বলে উঠলেন। যেন তাঁর সর্ব শরীরে বিছুটি দংশন করছে। তিনি বিকৃত স্বরে বললেন, আচ্ছা আগে শয়তানীকে আন, তাকে পুরিয়ে মারি। নিজের চোখে দেখি ওর পুড়ে মরা। তারপর দেখবো সে কুকুরটা কোথায় পালায়! আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও ওকে খুঁজে বের করবো।

মাটি দিয়ে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে টেনে আনা হলো সোনালীকে। শক্ত দড়ির বাঁধনে তাঁর সোনার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। সোনার চুল বিস্রস্ত! একটি সত্যিকারের সোনার প্রতিমাকেই যেন ধুলো মাখিয়েছে ওরা! তাকে এনে বাঁধা হলো সেই দণ্ডের সঙ্গে। জনতার কথায় যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ত্রিস্তান পালিয়ে গেছে, এক বিন্দু অশ্রু খসে পড়লো তাঁর চোখ থেকে। সূর্যের আলোয় আগুনের মতো জ্বলছে তাঁর সোনার চুল। তাঁর গড়িয়ে পড়া অশ্রুও যেন মনে হলো এক ফোঁটা গলিত স্বর্ণ।

প্রহরীরা আগুন লাগাতে যাবে, এমন সময় দিনাস এসে উপস্থিত হলেন। রাজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, মহারাজ, ক্রোধের বসে আপনি এ কি করছেন? বিনা বিচারে কোনো সৎ রাজা কারুকে শাস্তি দেয় না। পরে এজন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

—আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।

—মহারাজ, আমি আপনার প্রজা নই। কিন্তু বহু বিপদে আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। তার প্রতিদান হিসাবে আপনি রানীকে আমায় দান করুন। আপনি তো ওঁকে মেরে ফেলতেই চান, তার বদলে আমাকে দান করে দিন। অথবা বিচার করুন ওঁর অপরাধ। হয়তো পুরোটাই আপনার ভুল। ত্রিস্তান রানীর ঘরে কয়েক মুহূর্তের জন্য গিয়েছিল তাতে কি হয়? কিছুই না।

—আমার প্রমাণের দরকার নেই। আমি সব জানি।

—মহারাজ, আর একটা কথা ভেবে দেখুন। রানীকে যদি পুড়িয়ে মারেন, তবে আর কোনো দিন আপনার রাজ্যে শান্তি থাকবে না। ত্রিস্তান পালিয়েছে। সে কি প্রতিশোধ নেবে না? এ রাজ্যের পথ ঘাট, পাহাড় গুহা-জঙ্গল সব তার চেনা। সে এখানেই লুকিয়ে থাকবে। ভয়ংকর ক্রোধে, প্রতিশোধের ইচ্ছায় বারবার হানা দিয়ে এ রাজ্য ছারখার করে দেবে। আপনাকে সে ভালোবাসে, আপনার গায়ে সে হয়তো হাত তুলবে না, কিন্তু এ রাজ্যে আর কে আছে তার তলোয়ারের সামনে দাঁড়াতে পারে-!

—এসব কথা পরে শুনবো, আগে এই পাপীয়সী, বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি হয়ে যাক।

—মহারাজ, ও যদি আপনার এতই দু'চোখের বিষ হয় তবে সোনালীকে আমায় দিয়ে দিন। আমার সেবার পুরস্কার হিসাবে। আমি ওর জন্য দায়ী থাকবো। আমি ওকে মায়ের সম্মান দিয়ে আমার প্রাসাদে রাখবো। তারপর যদি কখনো আপনার রাগ পড়ে...

—দিনাস, তুমি আমার সময় নষ্ট করো না। আমি কথা দিচ্ছি, এরপর থেকে সকলের ক্ষেত্রে আমি সুবিচার করবো। কিন্তু, এই কুলটা স্ত্রীলোকটাকে আমি এক্ষুণি মেরে ফেলতে চাই। আমি ওকে ভালোবেসেছিলুম, এই তার প্রতিদান!

জমিদার দিনাস তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মহারাজ, আর কোনো দিন আমি আপনার রাজ্যে পা দেবো না। আজ থেকে আমি আর আপনার বন্ধু নই! ঘোড়ায় উঠে চলে গেলেন দিনাস। সোনালী তার দিকে তাকিয়ে ম্লানভাবে হাসলেন, সেই ক্লিষ্ট হাসিতে অনেক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ছিল।

রাজার হুকুমে সোনালীর পায়ের কাছের গর্তের শুকনো কাঠকুটোয় আগুন লাগনো হলো। দাউ দাউ করে পায়ের কাছে জ্বলে উঠলো আগুনের শিখা। সোনালীর মাথার চুল অগ্নিবর্ণ। এমন মূর্তি কেউ কখনো দেখেনি। জনতা হায় হায় করে কেঁদে উঠলো।

এমন সময় একশোজন কুষ্ঠরোগী এলো দল বেঁধে। তারা প্রহরীদের অগ্রাহ্য করে তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে দিল। তাদের নেতা ইভান বললো, মহারাজ, একটু অপেক্ষা করুন। পুড়িয়ে মারতে হয় একটু পরে মারবেন। তার আগে আমার একটা প্রস্তাব আছে। পুড়িয়ে মারলে তো ওর যন্ত্রণা এখুনি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার চেয়ে এমন উপায় যদি বলতে পারি—যাতে অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে দীর্ঘদিন দগ্ধে দগ্ধে মরবেন উনি, তাহলে—

রাজা বললেন, পুড়িয়ে মারার চেয়েও বেশি যন্ত্রণার শাস্তির কথা যদি কেউ আমাকে বলতে পারে, তবে আমি তাকে পুরস্কার দেবো।

শুনে কুষ্ঠরোগীর দল খিক্ খিক্ করে হেসে উঠলো। একশোজন কুষ্ঠো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—কেউ ক্র্যাচে ভর দিয়ে, কেউ লাঠি হাতে। সারা শরীরে ঘা, চোখগুলো ফোলা ফোলা, কারুর হাতের আঙুল গলে পড়ে গেছে। ওরা থাকে শহরের বাইরে, মানুষ ওদের কাছে ঘৃণায় যায় না।

ওদের নেতা ইভান বললো, মহরাজ, আমরা একশোজন খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। রানী সোনালীকে আমাদের হাতে দিন। আমরা সবাই মিলে ওঁকে ভোগ করবো। মহারাজ, আমাদের শরীরে কুষ্ঠ, তা বলে তো আমাদের ভোগ-বাসনা মরে যায়নি। কতদিন আমরা স্ত্রীলোকের স্বাদ পাইনি। রানীর এর চেয়ে বেশি শাস্তি আর কি হতে পারে। রানী আমাদের আলিঙ্গনে ঘৃণায় চোখ বুজবেন। প্রতি মুহূর্তে মরতে চাইবেন। অথচ আমরা ওকে সহজে মরতে দেবো না। ওঁরও শরীরে কুষ্ঠ হবে, একটু একটু করে পচে গলে যাবে এ রূপ, প্রত্যেক দিন পাপের ফল ভোগ করবেন। মহারাজ, এ শাস্তি আপনার পছন্দ হয় না?

রাজা মার্ক মাথা নিচু করলেন। ক্রোধের চেয়ে বড় শত্রু তো মানুষের নেই। রাজা তখন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। ক্রোধের চেয়েও বেশি তাঁর অপমান। ত্রিস্তান আর রানীকে তিনি সত্যিই ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসার অপমানে তিনি হিংস্র হয়ে উঠেছেন। তাই বলে উঠলেন, দাও, রানীর বাঁধন খুলে ওদের হাতে দিয়ে দাও।

সোনালী এতক্ষণ একবারও কাঁদেননি। এবার, বাঁধন খুলে দেবার পর চিৎকার করে ছুটে এসে রাজার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, মহারাজ, যদি কখনো আমাকে একটুও ভালোবেসে থাকেন, তবে সে কথা মনে করে আমাকে এক্ষুনি মারুন। ওদের হাতে দেবেন না। আমাকে আপনি নিজের চোখের সামনে হত্যা করুন। মহারাজ—

রাজা ঘৃণায় রানীকে পা দিয়ে ঠেলে দিয়ে বললেন, যাও, ঐ তোমার যোগ্য জায়গা!

রানী তবু আর্তকণ্ঠে বললেন, মহারাজ, আমি আপনার কাছে দয়া চাইবো না কিন্তু আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তো আপনারই কলঙ্ক। লোকে তো বলবে, আপনারই রানী-

রাজা গর্জন করে বললেন, এ রাজ্যে আজ থেকে যে রানীর নাম উচ্চারণ করবে, তাকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো!

কুষ্টির দল আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলো। তারপর সকলে মিলে ঘিরে নিয়ে চললো সোনালীকে। সোনালী তখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু চাইছেন। ইভান তাঁর গায়ে হাত দিতে এলে তিনি কুঁকড়ে কুঁকড়ে সরে যাচ্ছেন। সমবেত জনতার দীর্ঘশ্বাস, রানীর কান্না আর কুষ্ঠরোগীদের নিষ্ঠুর উল্লাসে কি মর্মান্তিক নিষ্ঠুর পরিবেশ।

হল্লা করতে করতে ওরা নিয়ে চললো রানীকে। জনতার এক অংশও বুক চাপা হাহাকারে চললো সঙ্গে সঙ্গে। সেই শ্মশানভূমিতে নিজের আসনে রাজা চুপ করে বসে রইলেন। একটাও কথা বললেন না। তাঁর মাথা ঝুলে পড়লো বুকের কাছে। সৈন্য-সামন্তরাও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউই বুঝতে পারছে না—এখন কি করবে। ঘটনার এত দ্রুত পরিবর্তনের ধাক্কা কেউ সামলাতে পারছে না। কাল সকালে এদেশ ছিল কী সুন্দর শান্তির দেশ, আর আজ সকালে এ কী দৃশ্য। সৈন্যরা অনেকে ভয় পেতে লাগলো, রাগে-শোকে-দুঃখে মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়কেন না তো?

কুষ্ঠরোগীরা এসে পৌছালো পাহাড়ের গুহার কাছে। এই গুহার অন্ধকারে তাদের দিন কাটে। গুহার মুখে এসে রানীকে ঘিরে নাচতে লাগলো। চোখ বন্ধ করে রানী দাঁড়িয়ে আছেন মাঝখানে, আর তাকে ঘিরে বিকৃতভাবে চিৎকার করছে একশোজন বিকলাঙ্গ মানুষ। এই দৃশ্য দেখেও সূর্য চোখ বোজেন নি, বাতাস বন্ধ হয়ে যায়নি, মা বসুমতি কেঁপে ওঠেননি লজ্জায়। প্রকৃতি বড় উদাসীন, মানুষের সুখ-দুঃখ অনুযায়ী প্রকৃতির রূপ বদলায় না।

এদিকে পথের পাশের ঝোপে লুকিয়ে থেকে ছট্‌ফট্‌ করছে ত্রিস্তান। বারবার গুরুকে বলছে, গুরু, আর কতক্ষণ এই রকম কাপুরুষের মতো বসে থাকবো? যদি সব শেষ হয়ে যায়, তারপর আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? এতক্ষণে হয়তো সোনালীকে পুড়িয়ে মেরেছে। না গুরুদেব, আমি যাই।

গুরু বললেন, আর একটু ধৈর্য ধরো! ওই যে দূরে একদল লোক আসছে, শুনি, ওরা কি বলে!

একদল লোক নিজেদের মধ্যে বিলাপ করতে করতে আসছিল। হায়! হায়! রাজা হঠাৎ এ কি রকম হয়ে গেলেন, তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! রানী যতই দোষ করে থাকুন, তাঁকে তিনি কুষ্ঠরোগীদের হাতে দিয়ে দেবেন? এতক্ষণ কুষ্ঠরোগীরা হয়তো রানীকে নিয়ে গুহায় পৌঁচেছে—ইস্‌ ও নরকে ঢোকার আগে রানীর মরে যাওয়াই ভালো।

হলুদ বাঘ যেমন ঝোপ থেকে বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে, সেই-রকম বেগে গুরুকে নিয়ে অশ্বারোহী ত্রিস্তান বেরিয়ে এলো রাস্তায়—ছুটে চললো পাহাড়ের গুহার দিকে।

নাচ থামিয়ে ইভান তখন সঙ্গীদের বলছে, ভাইসব, আজ আমাদের জীবন ধন্য। কুষ্ঠরোগ দেবার জন্য আজ ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। ভাগ্যিস কুষ্ঠরোগী হয়েছিলাম, তাই তো রানী সোনালীর মতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে পেলাম। কিন্তু, আমি তোমাদের সর্দার, প্রথম এক সপ্তাহ রানীকে একা একা ভোগ করবো। তারপর তোমরা এক এক করে। প্রথম সপ্তাহ রানী আমার! এসো রানী।

ইভান হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল রানীর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রুদ্র মূর্তিতে উপস্থিত হলো ত্রিস্তান। চেঁচিয়ে বললো, সাবধান ইভান! তুই বড় বেশি সময় রানীর কাছে থেকেছিস। বামন হয়ে তুই চাঁদের গায়ে ছায়া ফেলতে চাইছিস। সাবধান আর এক মুহূর্তও যদি—

এতদিন পরে একজন নারীকে পেয়ে, তাও রানী সোনালীর মতো রমণী শ্রেষ্ঠ আবার হাতছাড়া হবার উপক্রম দেখে কুষ্ঠরোগীর দল ক্ষেপে উঠলো। ইভান চিৎকার করে উঠলো, ভাইসব হুঁশিয়ার! যুদ্ধ! অমনি সব কটা কুষ্ঠি যে যার ক্র্যাচ, লাঠিসোটা উঁচিয়ে এলো মারমার শব্দে। সে কি হুড়োহুড়ি আর চিৎকার!

আপনারা যাঁরা এ কাহিনী শুনেছেন, এবার একটা কথা বিচার করে দেখুন। অনেক অর্বাচীন কবি এইখানে লিখেছে যে, ত্রিস্তান নাকি তলোয়ারের কোপে ইভানের মাথা কেটে ফেলেছিল। আপনারাই বলুন হুজুর, তাও কখনো সম্ভব? ত্রিস্তানের মতো ওরকম মহৎ বীরপুরুষ কখনো একটা খোঁড়া লোকের গায়ে হাত তুলতে পারে? অমন উদার অন্তঃকরণ যার—সে কখনো দুর্বল, অস্ত্রহীন, অশক্তের গায়ে আঘাত করে না। আসল কথাটা আমি জানি হুজুর, ত্রিস্তান নয়, গুরু গরভেনালই রাগের মাথায় একটা ওক গাছের ডাল ভেঙে ইভানের মাথায় এমন জোরে মেরেছিলেন যে, তার মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে ছাতু হয়ে যায়। ত্রিস্তান তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রানী সোনালীকে তুলে নিল সামনে, সেই ঘোড়ার পিছনে তুলে নিল গরভেনালকে। তারপর ঘোড়ার মুখ ফেরালো বিপরীত দিকে। এই ঘোড়াতেই তিনজনে কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের জঙ্গলে।

## ।। আট ।।

এবার আরম্ভ হলো ওদের নির্বাসিত অরণ্যজীবন। গভীর জঙ্গলের মধ্যে সারা দিন ওরা সতর্ক হয়ে লুকিয়ে থাকে। রাত্রিবেলা লতাপাতা বিছিয়ে ঘুমোয়, পরদিন আবার সে জায়গা ছেড়ে চলে যায়। এক জায়গায় কখনো বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু ওদের কোনো কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। যারা ভালোবাসাকে জেনেছে তাদের কাছে দুগ্ধফেননিভ বিছানা আর তৃণশয্যায় কোনো তফাত নেই। তাদের কাছে বনের কন্টকও মনে হয় কুসুম। প্রখর রোদ্দুরও মনে হয় চন্দনের মতো ঠাণ্ডা। রাত্রে যখন ত্রিস্তানের বিশাল বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকেন সোনালী তখন মনে হয় ওরা স্বর্গের দুটি গন্ধর্ব, ছদ্মবেশে পৃথিবীতে রয়েছে।

একদিন বনের মধ্যে দুজন শিকারী এসেছিল, ত্রিস্তান আর গরভেনাল গাছের ওপর থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর। ওদের তীর ধনুক কেড়ে নিয়ে ত্রিস্তান বললো, তোমাকে প্রাণে মারলুম না। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে বলো, কেউ যদি এ অরণ্যে ঢোকে, তাহলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। আমি ত্রিস্তান, এ অরণ্য আমার।

ত্রিস্তানের তীর–ধনুক দরকার ছিল। জঙ্গলে তলোয়ার বেশি কাজে লাগে না। শিকারের জন্য তীর–ধনুক লাগে। হরিণ মেরে সেই মাংস পুড়িয়ে খায়। মাঝে মাঝে ত্রিস্তান ছোটখাটো ডাকাতি করতে লাগলো। জঙ্গলে কখনো দু–একজন শিকারী ঢুকে পড়লেই ত্রিস্তান সঙ্গে সঙ্গে খুন করে অস্ত্র–শস্ত্র কেড়ে নিত। সব সময় খুন করার দরকার না হলেও খুন করতো। যাতে তার নামে একটা সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। যাতে আর কেউ এসে তাদের শান্তি বিঘ্ন করতে সাহস না পায়। সত্যিই আশেপাশের সবকটা রাজ্যে ত্রিস্তানের নামে একটা বিভীষিকা রটে গেল। সে তখন বেপরোয়া নিষ্ঠুর। তার সামনে পড়লে আর কারো নিস্তার নেই।

তবু ওরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। জঙ্গলেরই একদিক থেকে অন্যদিক চলে যায়। ওদের পোশাক ছিঁড়ে ঝুলি ঝুলি হয়ে গেল, শরীর ক্ষত–বিক্ষত, ধূলিমলিন তবু ওদের কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। সোনালীকে আলিঙ্গন করে ত্রিস্তান যখন চুম্বন করে, তখনই ওর মনে হয় এই চুম্বন যেন মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এই ভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থাতেই যেন ওরা মরতে পারে।

মাঝে মাঝে সোনালী যখন ঝরনার জলে স্নান করে, ত্রিস্তান তীরে বসে পাহাড়া দেয়, গরভেনাল তখন যান শিকারের সন্ধানে। ঝরনার স্বচ্ছ জলে সোনালীর সম্পূর্ণ শরীর দেখতে দেখতে ত্রিস্তানের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মনে হয় সোনালী যেন অলৌকিক মায়া। এত রূপ কি কোন মানুষের হয়? এতরূপ বুঝি এই পৃথিবীতে মানায় না। পৃথিবীতে রূপের সঙ্গে অনেকখানি দুর্ভোগ্য জড়ানো। এ যেন স্বর্গ থেকে কোনো দেবী এসে জলকেলি করছে। এখুনি আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে। পাছে অদৃশ্য হয়ে যায়, এই ভয়ে ত্রিস্তান নিজেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনালীকে জড়িয়ে ধরে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওরা দেখলো বনের মধ্যে একটা পাতার কুটির। ওটা ঋষি অগরুর আশ্রম। খর্বকায়, বৃদ্ধ ঋষি ওদের দেখে বললেন, বুঝেছি, তোমরাই ত্রিস্তান আর সোনালী। এসো এসো।

ঋষি ওদের ফলমূল খেতে দিলেন। তারপর বললেন, আমি কয়েকদিন আগে নগরে গিয়েছিলাম। তোমাদের কথা শুনে এলাম! শোনো ত্রিস্তান, রাজা ঘোষণা করেছেন, যে

তোমাকে ধরতে পারবে, তাকে তিনি দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন। কর্নওয়ালের প্রতিটি নাইট শপথ করেছে, তোমাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় বন্দী করবেই।

এ কথায় ত্রিস্তান সামান্য হাসলো।

ঋষি আবার মৃদু স্বরে বললেন, শোনো ত্রিস্তান, পাপী যদি তার পাপের জন্য অনুতাপ করে, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন। ত্রিস্তান, এখনও সময় আছে, তুমি অনুতাপ করো।

ত্রিস্তান অবাক হয়ে বললো, অনুতাপ করবো? কেন? আমি তো কোনো পাপ করিনি। ভালোবাসা কি পাপ? আমি সোনালীকে ভালোবাসি, একথা আমি ঈশ্বরের কাছে দাঁড়িয়েও বলবো। আমি সারাজীবন বনে জঙ্গলে ফলমূল কাঁচা মাংস খেয়ে থাকবো, যদি সোনালী সঙ্গে থাকে। সোনালীকে হারিয়ে আমি পুরো পৃথিবীর সম্রাটও হতে চাই না।

—তুমি চঞ্চল, ত্রিস্তান। তোমার ভালোবাসায় তুমি এ জীবনের সুখও হারালে পরপারের জীবনেও সুখ পাবে না। যে লোক তাঁর প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার শাস্তি, দুই ঘোড়ার মাঝখানে তাকে বেঁধে চিরে ফেলা। মরার পর যেখানে তার ছাই ফেলা হয়, সেখানে আর ঘাস গজায় না। আশেপাশের গাছপালা মরে যায়। ত্রিস্তান, এখনো তুমি রানীকে ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দাও তাঁর স্বামীর কাছে, ধর্মমতে অগ্নি সাক্ষী করে যাঁর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও।

রানীর কোনো স্বামী নেই। রাজা ওঁকে কুষ্ঠরোগীদের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন আমি তাদের কাছ থেকে ওঁকে কেড়ে এনেছি। ওঁর ওপর রাজার আর কোনো অধিকার নেই। এখন ও আমার। কেউ ওঁকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

রানী তখন ঋষির পায়ের কাছে বসে কাঁদতে লাগলেন। অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, আমি হতভাগিনী, কিন্তু আমরাও কোনো পাপ করিনি। কোনো পাপ করিনি। আমরা যে দুজনের কাছে দুজনে বাঁধা।

ঋষি বললেন, আবার বলছি, ত্রিস্তান, এখনো অনুতাপ করো!

—না, আমি অনুতপ্ত হবো না। যদি ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা না করেন, আমিও ঈশ্বরকে ক্ষমা করবো না। আমি এই জঙ্গলের রাজা হয়ে থাকবো। কারুর সাধ্যি নেই, আমাকে বাঁধা দেয়। ঈশ্বরের ও না। এসো সোনালী।

ওরা দুজনে হাত ধরাধরি করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলে গেল বনের মধ্যে। কিছুক্ষণ ওদের পদশব্দ শোনা গেল।

এবার গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওরা একটা ছোট্ট পাতার কুঁড়েঘর তৈরি করলো। রাত্তির বেলা গরভেনাল আর ত্রিস্তান পালা করে জেগে পাহারা দেয়। অনেক দিন আর কেউ এলো না ওদের ব্যাঘাত করতে।

একদিন গরভেনাল বনের মধ্যে ঘুরে দেখলেন একজন অশ্বারোহী নাইট। এ সেই বদমাইস চারজন নাইটের মধ্যে সবচেয়ে বড় বদমাইশটি। রাজার পুরস্কারের ঘোষণা শুনে এবং নিজের বীরত্ব দেখাবার অতি উৎসাহে একা এসেছে বনে। চুপি চুপি চোরের মতো এগোচ্ছে। যদি গোপনে দূর থেকে ত্রিস্তানকে খুন করতে পারে। এই ইচ্ছে! গরভেনাল ওকে দেখে একটা বড় গাছের ওপর উঠে বসে রইলেন। ধনুক বাগিয়ে এক পা এক পা করে আসছে নাইট। ঝুপ করে তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন গরভেনাল। কিন্তু বয়েস হয়েছে, গরভেনাল শক্তিতে পারলেন না সেই তরুণ নাইটের সঙ্গে। নাইট হঠাৎ গরভেনালকে নিচে ফেলে তলোয়ার বসিয়ে দিলো। গরভেনাল মৃত্যু-চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

আওয়াজ শুনে ছুটে এলো ত্রিস্তান। গরভেনাল শুধু মরার আগে শেষ কথা বললেন, ত্রিস্তান, প্রতিশোধ। ত্রিস্তান রক্তচক্ষে তাকালেন নাইটের দিকে। তাকে যুদ্ধ করতে হলো না নিজের তরবারি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করতেই নাইটের হাত থেকে তলোয়ার খসে গেল। ত্রিস্তান পাগলের মতো নাইটকে তলোয়ারে বারবার আঘাত করতে লাগলো। নাইটের মৃত্যুর বহু পরেও থামলো না। তারপর নাইটের মুণ্ডুটা কেটে দিয়ে, শুধু ধরটা বেঁধে দিল ঘোড়ার সঙ্গে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতেই ঘোড়া ছুটে গেল শহরের দিকে। ত্রিস্তান তার দুঃখ-দুর্দিনের বন্ধু, গুরু গরভেনালের মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো শিশুর মতো।

কান্না শুনে সোনালীও ছুটে এলেন। দেখলেন, গুরু গরভেনালের রক্তমাখা বুকের ওপর শুয়ে ত্রিস্তান ছটফট করছে। সোনালী অনেক রকম ঔষুধ জানতেন। কিন্তু গরভেনালকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তিনি সব চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন। তার মুখ প্রশান্ত।

ত্রিস্তানের আবাল্য সঙ্গী গরভেনাল। তিনি বিবাহ করেননি, তার সন্তান নেই বলেই বোধহয় ত্রিস্তানকে তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখেছিলেন। ত্রিস্তান যখন নিজের রাজ্য ছেড়ে আসে, তিনিও এসেছেন ওর সঙ্গে। ত্রিস্তানের প্রতিটি কাজে ছিল তাঁর সমর্থন। ত্রিস্তান-সোনালীর ভালোবাসার কথা জেনে, তিনি সব সময় ওদের সাহায্য করেছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, যাতে ওরা সুখী হয়।

ত্রিস্তান-সোনালীর অরণ্য-জীবনে এই প্রথম অমঙ্গল। নির্বাসিত হয়েও ওরা সুখে ছিল, জীবনে এমন সুখ ওরা আর কখনো পায়নি। খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, পোশাক ছিঁড়ে গেছে, তবু ওরা পেয়েছিল পরম সুখ। এই প্রথম দেখা দিল অশুভ সংকেত।

ত্রিস্তানকে টেনে তুললো সোনালী। তারপর বনের মাটি খুঁড়ে গরভেনালকে কবর দিয়ে অনেকক্ষণ স্থির শব্দে বসে কাঁদলো দুজনে।

কিছুদিন পর আবার সরল সুখে দিন কাটছিল ওদের। গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে শীত এলো। সমস্ত অরণ্য ঢেকে গেল বরফে। ঝুরঝুর করে সারাদিন বরফ পড়ে। ওদের গরম পোশাক নেই, সাধারণ পোশাকও ছিঁড়ে গেছে। তবু ওদের কোনো কষ্ট নেই, শীত নেই। দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করলেই মনে হয়, সমগ্র পৃথিবী উষ্ণ হয়ে গেছে।

শীতের পর আবার বসন্ত এলো। নরম রোদ্দুরে ঝক্ঝক্ করতে লাগলো অরণ্যের রাশি রাশি ফুল। ত্রিস্তান ছেলেবেলা থেকেই একটা বিদ্যে জানতো। পাখিদের অনুকরণ করে ও ঠিক পাখির মতো ডাকতে পারতো। কুটিরের দরজায় বসে ও যখন বনের পাখিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শিষ দিয়ে ওদের মতো গান গাইতো, সোনালী হেসে লুটিয়ে পড়তেন। ত্রিস্তানের ডাক শুনে হাজার হাজার পাখি এসে বসতো ওদের কুটিরের সামনে। রানী মাঝে মাঝে অভিমান করে বলতেন ত্রিস্তান, তুমি বুঝি অন্য মেয়ে চাও?

ত্রিস্তান হেসে বলতো, না সোনালী, তোমাকে ছাড়া সারা জীবন আমি অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করিনি। করবোও না।

এবার শুনুন প্রভু, এক অদ্ভুত ঘটনা। একদিন ত্রিস্তান সারাদিন শিকারের জন্য ছোটাছুটি করছিল। হঠাৎ এক সময় ত্রিস্তানের পা মচকে গেল। তখন সে শিকার ছেড়ে ফিরে এলো কুটিরে।

৬

ত্রিস্তান ফিরে আসতেই সোনালী বললেন, একি ত্রিস্তান, তোমাকে এমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে? ত্রিস্তান বললো, সখী, আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। আমি একটু শুয়ে থাকি। পোশাক খোলারও তর সইলো না, সেই বারান্দাতেই শুয়ে রইলো ত্রিস্তান। তলোয়ারটা পাশে খুলে রাখলো। যেমন সব সময় রাখে, যদি হঠাৎ কোনো বিপদ এসে যায়। রানীও ত্রিস্তানের পাশে শুয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। এক সময় ওঁরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লেন। রাণী আর ত্রিস্তান পাশাপাশি।

এদিকে হয়েছে কি, একজন কাঠুরে তার আগের দিন দূর থেকে ত্রিস্তানের কুটির দেখতে পেয়েছিল। ত্রিস্তানকে চিনতে পেরেই সে ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কথাটা গোপন রাখতেও ও ছটফট করছে। শেষকালে, সন্ধ্যেবেলা রাজা মার্কের কাছে গিয়ে বললো, মহারাজ, আপনার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে। রাজা আড়ালে গিয়ে যখন কাঠুরের কথা শুনলেন, তখন বললেন, তুমি সেই জায়গা আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবে? যদি না পারো, তোমার তাহলে মৃত্যু।

পরদিন, রাজা কারুকে কিছু না বলে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে একা বেরিয়ে পড়লেন কাঠুরের সঙ্গে। কাঠুরে দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পালালো। রাজা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন, তাঁর অভিমান–ভরা হৃদয়ে তিনি শপথ করলেন, আজ তিনি বা ত্রিস্তান দুজনের একজন মরবে।

সেই সময়ই ত্রিস্তান আর সোনালী পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে। মাঝখানে খোলা তলোয়ার। রাজার মুখ কঠিন হয়ে এলো।

রাজা তলোয়ার তুলে ত্রিস্তানকে খুন করতে গিয়েও হঠাৎ এক মুহূর্ত থেমে গেলেন। হঠাৎ তিনি ভাবলেন ওরা শুয়ে আছে পাশাপাশি, অথচ মাঝখানে খোলা তলোয়ার কেন? প্রেমিক–প্রেমিকা কি এভাবে শুয়ে থাকে।

ওদের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাজার বুক দুলে উঠলো। কতদিন পর তিনি দেখছেন ত্রিস্তান আর সোনালীকে—যারা এক সময়ে ছিল তাঁর দু চোখের দুই মণি। ঘুমন্ত মানুষের মুখ বড় সরল দেখায়। ঘুমন্ত মানুষের ওপর অতি পাষণ্ডও রাগ করতে পারে না! রাজা ভাবলেন, তাহলে ওরা কি নিরপরাধ? আমি আগাগোড়াই ভুল ভেবেছি? এ কথা তো সারা পৃথিবী জানে যে, নারী ও পুরুষের মাঝখানে খোলা তলোয়ার রেখে দেওয়া মানে তাদের সম্পর্ক পবিত্র। ওরা যদি উন্মাদের মতো পরস্পরকে ভালোবেসে থাকে, তাহলে কি শুয়ে থাকবে এরকম নিষ্পাপ ভঙ্গীতে; পাশাপাশি অথচ দুজন দুজনকে না ছুঁয়ে?

যাই হোক, আমি এখন ওদের খুন করতে পারি না। ঘুমন্ত মানুষকে খুন করলে জীবনে আমার সে অপবাদ দূর হবে না! আর যদি ত্রিস্তানকে জাগিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য ডাকি তা হলে ত্রিস্তান যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তলোয়ার না ছোঁয়, তবে তখন আমি ওকে মারতেও পারব না— আহা কি চেহারা হয়েছে ওদের! ঐ ত্রিস্তান, যে ছিল আমার রাজ্যের সেরা সুপুরুষ, তার আজ কি হতভাগ্যের মতো দশা! আর এই আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজকুমারী, ত্রিস্তান ওকে জয় করে এনেছিল আমারই জন্য। ওর মতো রূপসী এ রাজ্যে কেউ কখনো দেখেনি, সে কিনা শুয়ে আছে শুকনো মাটিতে ছেঁড়া পোশাকে। ঈশ্বর কাকে কোথায় নিয়ে যান কে জানে। যাক তোমাদের যেমন ইচ্ছা থাকো, আমি আর বাঁধা দেবো না। হয়তো তোমরাই সুখী, আমি স্বার্থপর হয়ে তোমাদের বিঘ্ন ঘটাচ্ছি। থাক, তোমরাই সুখে থাকো। আমি চলে যাই।

রাজা হাঁটু মুড়ে বসে আলতোভাবে সোনালীর একটা হাত তুলে নিলেন। কত রোগা হয়ে গেছে। বিয়ের দিন রাজা যে আংটি দিয়েছিলেন, সেটা আঙুলে ঢল্ ঢল্ করছে। রাজা আস্তে আস্তে আংটিটা খুলে নিলেন। তারপর বিয়ের দিন যে আংটিটা সোনালী তাঁকে দিয়েছিলেন, নিজের হাতে থেকে সেই আংটিটা খুলে রানীর হাতে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলেন। আংটি বদল হবার পর সোনালীর হাতে একবার আলতোভাবে চুমু খেয়ে নামিয়ে রাখলেন হাত। ওদের মাঝখান থেকে তলোয়ারটা তুলে নিলেন এবার। এই সেই ডগাভাঙা তলোয়ার, যা দিয়ে ত্রিস্তান মোহরহন্টকে হত্যা করেছিল, রাজা চিনতে পারলেন। এই তলোয়ার তার রাজ্যের গর্ব। রাজা ত্রিস্তানের তলোয়ারটা নিজের খাপে ঢুকিয়ে, নিজের মণিমুক্ত খচিত তলোয়ার রেখে দিলেন।

রাজা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, বিদায়! তোমরা যদি সুখে থাকতে পারো, থাকো। আমি আর তোমাদের বাঁধা দেবো না। তারপর রাজা বেরিয়ে গেলেন।

ঘুমের মধ্যে সোনালী স্বপ্ন দেখলেন, দুটো সিংহ যেন তাঁকে পাবার জন্য লড়াই করছে প্রচণ্ডভাবে। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, জড়িয়ে ধরলেন ত্রিস্তানকে। সোনালীর চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে তলোয়ার ধরলেন ত্রিস্তান। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, একি! ত্রিস্তান তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো রাজার তলোয়ার। সোনালীও নিজের হাতের আংটির দিকে চেয়ে কেঁদে উঠলেন, ত্রিস্তান, আর রক্ষা নেই। রাজা আমাদের খুঁজে পেয়েছেন।

রাজা আমার তলোয়ার নিয়ে গেছেন। বোধহয় একা এসেছিলেন, ভয় পেয়ে পালিয়েছেন। আবার ফিরে আসবেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে। আমাদের ধরে আবার পুড়িয়ে মারতে চান। চলো সোনালী, আর দেরী নয়, আমাদের পালাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ওরা ছুটে পালাতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে চলে গেল একেবারে সেই অরণ্যের অন্য প্রান্তে ওয়েলস্ দেশের সীমানার কাছে। হায়, ভালোবাসা ওদের কত দুঃখ দেবে।

## ।। নয় ।।

অরণ্যের অন্য প্রান্তে গিয়ে ওরা আবার বাসা বাঁধলো। কয়েকদিন পর ওরা আবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

একদিন কুটিরের সামনে ওরা বসে আছে, বসে বসে নানান গল্প করছে, এমন সময় সামনে দিয়ে ছুটে গেল একটা সুন্দর হরিণ। হরিণটা একটু অন্যরকম সবুজ ঘেঁষা রং, সারা গায়ে হলুদ ছিট্ ছিট্। সোনালী বললো, আমায় ঐ হরিণটা ধরে দাও না। মেরো না, জীবন্ত ধরে দাও আমি ওটাকে পুষবো।

হুজুর এই জায়গাটার কথা শুনে আপনাদের রামায়ণের কথা মনে পরে না? সেই দণ্ডক বনের কুটির প্রাঙ্গনে বসে আছেন রাম আর সীতা, সামনে দিয়ে ছুটে গেল সোনার মায়া হরিণ! কিন্তু ত্রিস্তান তো রামায়ণ গাথ্য জানে না।

তখুনি ত্রিস্তান তার ধনুক নিয়ে ছুটলো। ছুটতে ছুটতে যে কতদূর চলে গেল তার ঠিক নেই। তরুণ মৃগ বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে, তার সঙ্গে ত্রিস্তান ছুটে পারবে কেন? অথচ ত্রিস্তান বাণও মারতে পারছে না, কারণ সোনালী ওটা জীবন্ত চেয়েছে। ছুটতে ছুটতে ত্রিস্তান ক্লান্ত হয়ে গেল। দূরে মিলিয়ে গেল হরিণটা। ক্লান্ত ত্রিস্তান সেখানেই ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল।

মাথার ওপর পরিস্কার আকাশ। ঠাণ্ডা বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ত্রিস্তানের হঠাৎ মনে হলো, রাজা কি সেদিন সত্যিই ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন? কেন আমি তো ছিলাম ঘুমিয়ে। আমার প্রাণ তো ছিল রাজারই হাতে

অথবা আমার তলোয়ার সরিয়ে নিয়ে উনি তো আমাকে জীবন্ত অবস্থাতেও বন্দী করতে পারতেন। যদি আমার তলোয়ার সরিয়ে নিলেনই, তবে আবার নিজের বহুমূল্য তলোয়ারটা রেখে গেলেন কেন? মহারাজ, মহারাজ, আমি তোমাকে চিনি! তোমার বুকের স্নেহ মমতা আবার ফিরে এসেছে। আমাকে মারতে গিয়ে তোমার মনে পড়েছে সেই বালকটির কথা, যে তোমার পায়ের কাছে বসে বীণা বাজাতো। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো! কিংবা ক্ষমা হয়তো নয় রাজা বুঝতে পেরেছেন ঈশ্বর আমারই পক্ষে। নইলে বারবার আমি বেঁচে গেলাম কেন? গির্জার জানালা দিয়ে লাফিয়েও মরিনি, তার মানে ভগবান আমাকে মারতে চান না। হয়তো আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাজার সব পুরনো কথা মনে পড়েছিল। মোরহল্টের সঙ্গে আমার যুদ্ধ, আয়ারল্যাণ্ড অভিযান, ওঁর জন্যে আমার নিজের রাজ্য ছেড়ে আসা!

কিংবা উনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে উনি অন্যায় করেছেন। আমাকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কেন, আমি কি যে-কোন লোককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করিনি? কার সাধ্য ছিল আমার নামে অভিযোগ আনার? রাজা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমার মতো বন্ধু উনি আর পাবেন না। ওঁর বিপদের সময় আমার মতো নিঃস্বার্থভাবে আর কে ওঁর পাশে দাঁড়াবে? আবার কি উনি আমায় ফিরিয়ে নিতে চান ওঁর রাজ্যে? আবার আমি বর্ম পরে যুদ্ধে যাবো রাজার শত্রুকে জয় করতে? আবার আমি ওঁর সামনে বসে বীণা বাজাবো? না!... এসব আমি কি আবোল-তাবোল ভাবছি। আমার কি মাথা খারাপ! রাজার কাছে আমার ফিরে যাওয়া মানেই তো সোনালীকে ফিরিয়ে দেওয়া। আমার কাছ থেকে সোনালীকে নেয় কার সাধ্য!

মহারাজ, মহারাজ তুমি ঘুমের মধ্যে সেদিন আমাকে হত্যা করলে না কেন? সে যে অনেক ভালো ছিল। এ আমি কি দুর্ভাবনায় পড়লাম। সোনালীকে আমি বারবার জয় করেছি। আয়রল্যাণ্ড থেকে, তোমার হাত থেকে, কুষ্ঠরোগীদের কাছ থেকে। কিন্তু তুমি সেদিন যে করুণা দেখালে তাতে এই একবার তুমিও জয় করেছো, তুমিও রাণীকে জয় করেছো।... সোনালী ছিল তোমার পাশে রাণী, আর এখানে, আমার পাশে এসে, ও হয়েছে ভিখারিণী। ওর সোনার যৌবন বনে জঙ্গলে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে নষ্ট হচ্ছে। কত মখমল, সিল্কের পোশাক ছিল ওর, আজ ভালো করে লজ্জা নিবারণ করতে পারে না। সোনার পালঙ্কে কি কোমল শয্যায় ও শুয়ে থাকতো, আজ শুয়েছে কঠিন পাথরে। আমারই জন্য। সবই আমার জন্য। আমি ওকে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে এনেছি। হা ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও। আমার নিজের সুখের জন্য সোনালীকে এত কষ্ট দেবো কেন? ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দাও, শক্তি দাও, আমি সোনালীকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

রাজাই তার স্বামী, পবিত্র ধর্মমতে ওকে বিয়ে করেছেন সকলের সামনে। আমি কে? আমি একটা চোর।

সেদিন সারারাত আর ত্রিস্তান কুটিরে ফিরে গেল না। ঐখানে, বনের মধ্যে মাটিতে শুয়ে একা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার কান্না শুনলো অরণ্যের পশুরা আর আকাশের তারাদল। হয়তো সে কান্না শুনেই হিংস্র জন্তুরা ত্রিস্তানের ক্ষতি করতেও এলো না।

ওদিকে কুটিরে সোনালী সারারাত জেগে আছেন। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম এক রাত্রিতে ত্রিস্তান তাঁর সঙ্গে নেই। নিজের জন্য ভয় নেই তাঁর, ভয় হচ্ছে ত্রিস্তানের জন্য। হরিণ ধরতে গিয়ে কোথায় গেল? রাজা মার্কের ফিরিয়ে দেওয়া আংটিটা দেখে সোনালীর অনেক কথা মনে হতে লাগলো। যে লোক আমাকে কুষ্ঠরোগীদের হাতে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, সেই লোকই এবার আমাকে না মেরে, আংটিটা শুধু ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। রাজার মনে ফিরে এসেছে স্নেহ, মমতা। আমাকে উনি কত স্নেহ করেছেন, ভালোবেসেছেন। এই

বিদেশে আমাকে কোনো দুঃখ পেতে দেননি। কিন্তু আমি এলাম এ রাজ্যে কুগ্রহ হয়ে। রাজা কত ভালোবাসতেন ত্রিস্তানকে—আর আজ। যে ত্রিস্তান রাজা মার্কের জন্য নিজের রাজ্য পর্যন্ত ছেড়ে এলো, আজ সেই রাজাই ওর প্রধান শত্রু। কার জন্য? ত্রিস্তানের ছেলেবেলার নাম দুঃখ। সারাজীবন ওকে দুঃখই পেতে হলো কার জন্য? আমার, আমার–। আজ ত্রিস্তানের কোথায় থাকার কথা, সে এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, তার বীরত্বের খ্যাতি পৃথিবীময়, জমকালো পোশাক পরে সে সাদা ঘোড়ায় রাজপথ দিয়ে যাবে—লোকে তার দিকে তাকাবে গভীর সম্মানের চোখে...তার বদলে, আজ সে ছন্ন-ছাড়ার মতো বনে জঙ্গলে ঘুরছে, তার পোশাক নেই, তার কোনো আনন্দ নেই। বীর যোদ্ধা কখনও দিনের পর দিন যুদ্ধ না করে, নিজের শক্তির পরিচয় না দিয়ে থাকতে পারে? পাখি যেমন ওড়ে, বীর নাইট তেমনি যুদ্ধের চর্চা করে। তার বদলে এখানে সামান্য জীবজন্তু শিকার করা তার একমাত্র কাজ। রাজার যে সৈন্যরা একসময় তাকে দেখলেই অভিবাদন করতো, আজ তারাও ওকে দেখলে পশুর মতো তাড়া করবে শুধু আমার জন্য। শুধু আমার জন্য। হে ভগবান, আমার জন্য ত্রিস্তানের এই দুর্ভাগ্য। বীর পুরুষকে সামান্য মানুষের মতন জীবন কাটাতে দেখলে মেয়েরা কখনও সুখী হয় না।

এক সময় বাইরে পদশব্দ পাওয়া গেল। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিস্তান ফিরে আসছে। বিষণ্ণ তার মুখ। আজ সে এসেই সোনালীকে জড়িয়ে ধরলো না। সোনালী তাড়াতাড়ি এসে ত্রিস্তানের পোশাক খুলে দিতে লাগলেন। তলোয়ারটা যখন ত্রিস্তানের কোমর থেকে খুলছেন, তখন ত্রিস্তান গম্ভীর স্বরে বললো, এ তলোয়ার রাজার, এটা তিনি আমাদের বুকে বসিয়ে দিতে পারতেন, তার বদলে উপহার দিয়ে গেছেন।

সোনালী সেই তলোয়ারের মুক্তো বসানো বাঁটে চুমু খেলেন। দুফোঁটা জল এলো তাঁর চোখে। সেদিন দুজনের কেউ আর কোনো কথা বলতে পারলো না। হয়তো, মনে মনে ওরা দুজনে ভাবছে একই কথা।

দু-তিন দিন পর, ত্রিস্তান ধীর স্বরে সোনালীকে বললো, সখী, আমি ভেবে দেখলাম তোমার রাজার কাছে ফিরে যাওয়াই উচিত। রাজার মন থেকে রাগ পড়ে গেছে, তিনি তোমাকে বোধহয় ফিরে পাবার জন্য কাতর। আমার জন্য তুমি এতকষ্ট সহ্য করবে এ যে আমি আর সহ্য করতে পারি না। তুমি রাজার মেয়ে, তোমার কি এত কষ্ট সহ্য করবার কথা ছিল? আমি ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ কষ্টকে চিনি। কিন্তু, তোমার এই সোনার অঙ্গ— না, না, সোনালী—তোমার রাজার কাছে ফিরে যাওয়াই ঠিক, রাজা যদি আমাকেও ফিরিয়ে নেন, তবে আমি তাঁর সেবা করবো। অথবা আমি চলে যাবো অন্য রাজ্যে,আমার ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। কিন্তু আমার জন্য তোমাকে আর কষ্ট সইতে দেবো না।

সোনালী একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, সত্যি ত্রিস্তান, আমার জন্য তুমি কেন এত কষ্ট সহ্য করবে? আমি এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে তোমার দুঃখ যাবে না। ত্রিস্তান, ভালোবাসা কোনো মূল্য চায় না। তোমাকে ভালোবেসে আমি স্বর্গ পেয়েছি, কিন্তু তার জন্যে তোমার জীবনে এত মূল্য দিতে হবে কেন! আমার মৃত্যুই একমাত্র সমাধান!

ত্রিস্তান দুই করতলে তুলে ধরলো রানীর মুখ। দেখলো, সে মুখ বড় বিমর্ষ ম্লান। আস্তে আস্তে সে বললো, সোনালী, মৃত্যু যদি সমাধান হয় তবে মৃত্যু আসা উচিত আমার। সে মৃত্যু তো আমি পেয়েছি, বহুবার, তোমার ঐ বুকের মধ্যে। তোমার বুকে মাথা রেখে আমি যে সুখ পেয়েছি, তা মৃত্যুর মতোই তীব্র। কিন্তু সত্যি সত্যি শারীরিকভাবে মরতে আমি পারি না, তাহলে যে তোমাকে আর দেখতে পাব না। কিংবা দেখতে যদি নাও পাই, তুমি কোথায়

বেঁচে আছো, সুখে আছো জানতে পারলেই আমার সুখ। তুমি আমার দুঃখের কথা বলছো? দেখো, আমার জন্ম থেকেই আমার সারা শরীরে দুঃখের অজস্র চিহ্ন—যেদিন থেকে আমার মা মারা যান। দুঃখ কষ্ট আমার অঙ্গের ভূষণ। সোনালী, আমার মায়ের মৃত্যুর কথা আমি অনেক পড়ে শুনেছি। বড় দুঃখ পেয়ে মরেছেন তিনি। তোমাকে দেখলেও আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। তোমাকে আর আমি দুঃখ সইতে দিতে পারি না। দুঃখ তোমাকে মানায় না। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে কখনো তো তুমি দুঃখের মুখ দেখোনি।!

—ত্রিস্তান, আমার দুঃখ কোথায়! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তো আমার সারাজীবন দুঃখে কেটেছে। তোমার ভালোবাসা আমাকে যে সুখ দিয়েছে, পৃথিবীতে কোনো নারী সে সুখ কখনও পায়নি!

—না, সোনালী, আমার মনে অপরাধবোধ এসেছে। আমার মনে হয় এখন, রাজার কাছ থেকে আমি তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি শুধু আমার নিজেরই স্বার্থে। তোমাকে দেবার মতো আমার আছে শুধু ভালোবাসা, আর তো কিছু নেই তোমার এই জীর্ণ পোশাক, আজ তোমার শরীরের রং জ্বলে যাচ্ছে রোদ্দুরে, শীতে, এ তো আমারই জন্যে।

—আর তোমার রুক্ষ শরীর, ছেড়া-পোশাক আজ কার জন্যে!

—সে তো আমার প্রাপ্য! আমি হীন চোরের মতো পালিয়ে পালিযে বেড়াচ্ছি—আমাকে এ চেহারাতেই মানায়। কিন্তু তুমি রাণী, আমার জন্য তোমার এই দুর্দশা কেন? তুমি রাজার কাছে ফিরে যাও। তাঁর সেদিনের ব্যবহার দেখে মনে হয়, তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন। তিনি আবার তোমাকে ভালোবাসবেন, তোমার যোগ্য সম্মান দেবেন। আমি দূরে সরে যাবো।

সোনালী একটা বিরাট নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, চলো ত্রিস্তান, আমরা ঋষি অগরুর আশ্রমে গিয়েই ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করি।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা আবার চলে এলো ঋষির আশ্রমে। ঋষি ওদের দেখে চমকে উঠলেন। বললেন, ইস্, একি চেহারা হয়েছে তোমাদের? দেখো ভালোবাসা তোমাদের কতদূর নিয়ে গেছে! ত্রিস্তান, এখনও অনুতপ্ত হও, অনুতাপ ছাড়া মুক্তি নেই।

ত্রিস্তান গম্ভীরভাবে বললো, ঋষি, আপনি রাজার সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপনের একটা ব্যবস্থা করে দিন। আপনি রাজাকে চিঠি লিখে দিন রানীকে ফেরত পাঠাতে প্রস্তুত আমি, যদি তিনি তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। আমি নিজে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো—তাঁর আর চক্ষুশুল হবো না। কিন্তু রানীর সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তাঁকে!

সোনালী অগরুকে বললেন, প্রভু, আমি আমার ভালোবাসার জন্য একটি অনুতাপের বাক্যও উচ্চারণ করতে চাই না। কিন্তু আমাদের এ অবস্থার শেষ হোক!

ঋষি অগরু তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে রাজার রাজা, শেষ পর্যন্ত তুমি সব মানুষকেই সুমতি দাও! ধন্য তোমার করুণা।

ত্রিস্তান তা দেখে অভিমানী মুখে, মনে মনে বললো, না, আমি ঈশ্বরের ভয়ে সোনালীকে ফিরিয়ে দিতে আসিনি। পাপের জন্য আমি অনুতাপও করছি না। আমি সোনালীকে ফিরিয়ে দিতে চাই অন্য কারণে। ঋষি তুমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি সে কথা বুঝবে না!

ঋষি তারপর চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি লেখা শেষ হলে তিনি ওদের চিঠিটা পড়ে শোনালেন। ত্রিস্তান চিঠিতে আংটির ছাপ দিয়ে দিলেন।

ঋষি জিগ্যেস করলেন, কে চিঠি নিয়ে যাবে?

ত্রিস্তান উত্তর দিল, আমি।

—না, না তা হয় না। তোমাকে দেখলে প্রহীরা কোনো কথা শোনার আগেই হয়তো হত্যা করবে। না, ত্রিস্তান তুমি না!

—ঋষি, যদি মরার হতো, বহু আগেই তাহলে আমি মরে যেতাম। আমার পক্ষে মরা বড় কঠিন। ও চিঠি আমিই নিয়ে যাবো।

সেদিন সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসার পর ত্রিস্তান ঋষির কাছ থেকে একটা কালো কাপড় চেয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে মুখ ঢেকে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লো। বন পেরিয়ে সোজা চলে এলো দুর্গের প্রাচীরের কাছে। ততক্ষণে প্রায় মধ্যরাত। সেখানে ঘোড়া বেঁধে, লাফিয়ে পার হল প্রাচীর। তারপর উদ্যানের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে এলো রাজার শয়ন ঘরের নীচে। কেউ তাকে সন্দেহ করে নি। তা ছাড়া সন্দেহ করবেই বা কে? কেউ কি কল্পনা করতে পারে ত্রিস্তান একা এসে ঢুকবে রাজপুরীতে? ওকে কেউ চিনতে পারলেও বিশ্বাস করতো না। হয়তো ভাবতো ভূত দেখছে।

ত্রিস্তান অনুচ্চ স্বরে তিনবার ডাকলো, মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ।

সেই ডাক শুনে রাজা মার্কের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ভাবলেন, তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে বললেন, কে ডাকছো আমায় এত রাত্রে? কে তুমি?

—মহারাজ, আমি ত্রিস্তান।

—কে, কি নাম বললে?

—ত্রিস্তান!

—ত্রিস্তান? কোন্ ত্রিস্তান? এদিকে আলোর কাছে এসো!

আমি সেই পুরনো ত্রিস্তান। মহারাজ, আপনার কাছে একটা চিঠি দিচ্ছি, কাল এর উত্তর লিখে ঝুলিয়ে দেবেন বনের সীমান্তে শুক্‌নো ওক্ গাছে!

ঠক্ করে শব্দ হয়ে একটা তীর এসে পড়লো রাজার পায়ের কাছে। তার মাথায় বাঁধা চিঠি। রাজা ডেকে উঠলেন ত্রিস্তান, ত্রিস্তান, একটু দাঁড়াও।

কোন উত্তর নেই আর! রাজা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন বারান্দায়। বাগান তখন শূন্য—যতদূর দেখা যায় শুধু চাঁদের আলোর স্তব্ধতা। রাজা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন ত্রিস্তান, ত্রিস্তান, ওরে একটু দাঁড়া, একবার তোকে দেখি, ত্রিস্তান, ত্রিস্তান—

রাজার আকুল ডাক হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগলো। ত্রিস্তান তখন বহু দূরে। চিৎকার শুনে প্রহরীরা ছুটে এসে দেখলো রাজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাগলের মতো কাঁদছেন।

## ।। দশ ।।

সেই রাত্রেই রাজা মার্ক সমস্ত সভাসদ এবং অভিজাত রাজপুরুষদের ডেকে পাঠালেন। ঘুম চোখে সবাই উঠে আসতেই রাজা বললেন, আপনারা শুনুন ত্রিস্তান কি লিখেছে। মুন্সী, পড়ে শোনাও তো চিঠিটা।

সভাসদরা মাঝরাত্রে এই কাণ্ড দেখে অবাক। প্রৌঢ় রাজার একি নব যুবকের মতো উৎসাহ। আসলে এক ধরনের মানুষ থাকে, যাদের হৃদয়ে ভালোবাসা যেমন তীব্র, ঘৃণাও তেমনি তীব্র। রাজা মার্কের হৃদয়ে ভালোবাসাই বেশী, কিন্তু কিছুদিনের জন্য সেটা চাপা পড়ে গিয়ে তীব্র ঘৃণা জেগে উঠেছিল। আবার ভালোবাসা ফিরে এসেছে। ত্রিস্তান আর সোনালী, দুজনের জন্যই ভালোবাসা।

মুন্সী রাজার হুকুমে চিঠি পড়তে আরম্ভ করল ঃ

মহরাজ আপনাকে আমার প্রণাম। সভাসদদের আমার অভিবাদন। আমি ত্রিস্তান। মনে পড়ে মহারাজ, আমি সেই ত্রিস্তান যে জীবন তুচ্ছ করে আয়ারল্যাণ্ডে গিয়েছিল। মহারাজ, ওদেশের ড্রাগনকে আমিই হত্যা করেছি। ওদেশের রাজা তো আমার সঙ্গেই বিয়ে দিতে

চেয়েছিলেন রাজকন্যাকে। কিন্তু আমি আপনার নাম করে গিয়েছিলাম বলে, সেই রাজকন্যাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু আপনি নীচ লোকদের কথায় কান দিয়ে আমাদের সন্দেহ করতে শুরু করলেন। নীচ, কুমন্ত্রণাদাতারা আপনার মনে ঈর্ষা ঢুকিয়ে দিল, সেই ঈর্ষা থেকে জন্মালো ক্রোধ। ক্রোধের বসে আপনি বিনা বিচারে আমাদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তখন ঈশ্বর আমাদের সহায় হলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমি উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দিয়েও মরিনি। তারপর থেকে আমি আর কি দোষের কাজ করেছি? আপনি রানীকে সপে দিলেন কুষ্ঠরোগীদের হাতে, আমি তাদের হাত থেকে রানীকে উদ্ধার করেছি। আমি নাইট, বিপন্না রানীকে উদ্ধার করাই আমার ধর্ম। আমরা বনের মধ্যে লুকিয়েছিলাম। তখনই আমি রানীকে আপনার হাতে ফিরিয়ে দিতে আসতে পারিনি, কারণ আপনার ঘোষণা ছিল জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় আমাকে বন্দী করা। কিন্তু এখন আমি অনুরোধ করছি, রানী আপনার ধর্ম পত্নী তাঁকে আপনি গ্রহণ করুন। রানীর বিরুদ্ধে যদি কেউ কুৎসা রটাতে চায়, তবে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজী আছি। যার সত্যিকারের সৎসাহস আছে, সে-ই যেন প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে রানীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ জানায়, আড়ালে নয়। যদি এমন কেউ থাকে আপনি তাদের নাম আমাকে জানান, আমি তাদের সঙ্গে দেখা করে আমার হিসেব মিটিয়ে ফেলবো।

আমাকে আপনি পুনরায় গ্রহণ করবেন কিনা সেটা আপনার ইচ্ছে। আমি না হয় এদেশ ছেড়ে যাবো। কিন্তু মহারাজ, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি রানীকে পূর্ব সম্মানে ফিরিয়ে নিন। যদি না নিতে চান, আমি রানীকে আবার আয়ারল্যাণ্ডে ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। ওদেশের রাজকুমারী ওদেশেরই রানী হয়ে থাকবেন।

ইতি,
প্রণত ত্রিস্তান

এই চিঠি শুনে একজন সভাসদেরও প্রতিবাদ করতে সাহস হলো না। মনে পড়লো ত্রিস্তানের দুর্ধর্ষ মুখ, ঝকঝক তলোয়ার। সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, মহারাজ, রানীকে ফিরিয়ে আনুন। রানীর কলঙ্কের কোনো প্রমাণ নেই। রানী হলো রাজ্যের লক্ষ্মী, রানী না থাকলে কি রাজ্যে লক্ষ্মীশ্রী আসে। মহরাজ রানীকে ফিরিয়ে আনুন, কিন্তু—

—কিন্তু কি? মহারাজ গর্জে উঠলেন।

সভাসদরা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করে খানিকক্ষণ পরামর্শ করলো। তারপর বললো, মহারাজ, ত্রিস্তানকে আর ফিরিয়ে না আনাই ভালো। ও যখন অন্য দেশে চলে যেতে চায়, তবে তাই যাক্। ও ফিরে এলে আবার হয়তো নানা কথা উঠতে পারে।

মহারাজ বললেন, আপনারা আবার ভেবে দেখুন, রানীর নামে আপনাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা। কেউ ত্রিস্তানের সঙ্গে লড়াই করতে রাজী আছেন।

সকলেই বললো না মহারাজ, রানীর নামে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই।

রাজা তৎক্ষণাৎ মুন্সীকে বললেন, মুন্সী শিগগির চিঠি লেখো। আমি রানীকে ফিরিয়ে নিতে চাই। এ রাজ্যের রানী হয়ে সে গাছতলায় শুয়ে আছে। শিগগির চিঠি লিখে, বনের সীমান্তে বাজে পোড়া ওক গাছটায় ঝুলিয়ে রেখে এসো।

একটু থেমে আবার রাজা যোগ করে দিলেন, আর হ্যাঁ চিঠির শেষে আমার আশীর্বাদ জানিও। ওদের দুজনকেই।

শহর ছাড়িয়ে যেখান থেকে বন শুরু হয়েছে তার আগে একটা খোলা মাঠ। ঠিক হলো বনের সীমান্তে সেই মাঠে এসে ত্রিস্তান সোনালীকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে ত্রিস্তান সোনালীকে বললো, সখী, আজ বিদায়। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না। কিন্তু আমার জন্যে তুমি যে কষ্ট সহ্য করেছো, তা ভেবে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবার কষ্ট সহ্য করবো। তবে, আমি যতদূর দেশেই থাকি, মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে তোমার ঠিক খবর নেবো। তোমার কোনো বিপদের কথা শুনলে আবার ছুটে আসবো আমি।

সোনালী কাঁদতে কাঁদতে ত্রিস্তানের বুকে মুখ গুঁজে বললেন, দুঃখ আমার, তুমি আমার জন্য আর কত দুঃখ সইবে? ত্রিস্তান, আমার এই সবুজ পাথরের আংটিটা তুমি নাও যদি তোমার কাছ থেকে কোনো লোক এসে এই আংটি দেখায় আমি তার সব কথা বিশ্বাস করবো। সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলে আমায়, রাজপুরীর হাজারটা দেওয়ালেও আমায় আটকাতে পারবে না। আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও তোমার সঙ্গে দেখা করবো!

ত্রিস্তান কোনো কথা বলতে পারলো না। সোনালীর মুখখানি উঁচু করে তুলে সে চুম্বন করলো। বহুক্ষণ, যেন সে চুম্বন আর শেষ হবে না। তারপর সেই রকম আলিঙ্গনে আবদ্ধ অবস্থাতেই ওরা নীরবে বসে রইলো কিছুক্ষণ। একটু পরে বাইরে শুনতে পাওয়া গেল ঋষি অগরুর গলার আওয়াজ। ঋষির হাতে কতগুলো দামী সিল্কের পোশাক, মুক্তোর গয়না। লজ্জিত মুখে ঋষি বললেন, রানী, আমার কাছে কয়েক টুকরো সোনা ছিল। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার তো ওসব কোনো কাজে লাগে না, তাই এগুলোর বদলে তোমার জন্য কয়েকটা পোশাক নিয়ে এসেছি। তুমি রাজরানী, এই ছিন্নকন্থা পরে কি করে যাবে রাজ সন্নিধানে। তাই যথাসম্ভব...মানে, জানি না অবশ্য, তোমার পছন্দ হবে কি না। মেয়েদের পোশাক পছন্দ করার অভ্যাস তো আমার নেই।

কৃতজ্ঞতায় রানীর চোখে জল এসে গেল। তিনি ছুটে এসে ঋষির পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

এদিকে রাজা পাত্রমিত্রদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সেই প্রান্তরে। হাজার হাজার লোকও ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। জমিদার দিনাসও রাজার ওপর রাগ ভুলে আবার এসে হাজির হয়েছেন। প্রতীক্ষায় সবাই উদগ্রীব। কতদিন পর আবার ত্রিস্তান আর সোনালীকে দেখবে। কি ভাবে কোন্ রূপে তারা দেখা দেবে, এই নিয়ে সকলের কৌতূহল।

হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে এলো ত্রিস্তান আর সোনালী। রানী সুসজ্জিত, ত্রিস্তানের পরনে শতছিন্ন ময়লা পোশাক। ঘোড়ার পিঠে রানীকে বসিয়ে দীন ভৃত্যের মতন ত্রিস্তান পায়ে হেঁটে আসছে।

ত্রিস্তান রানীর কানে কানে বললো, সোনালী, আর হয়তো তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবো না। আমার শেষ অনুরোধ, কখনো যদি তোমাকে কোনো খবর পাঠাই, তুমি একটা উত্তর দিও।

—সোনালী বললেন, ত্রিস্তান কেন বলছো ও কথা। তুমি যদি আবার কোনদিন আমাকে ডাক পাঠাও, পৃথিবীর কোন শক্তি, রাজবাড়ির হাজারটা দেয়ালও আমাকে আটকে রাখতে পারবে না! তুমি তো জানো একথা।

সোনালী, তোমাকে আর আমি ডাকবো না। আর কোনোদিন তোমায় আমি রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে আনবো না।

—ও কথা বলো না, ত্রিস্তান। আমাদের নিয়তি এক সূতোয় বাঁধা। জানি না সে কোনদিকে যাবে।

ততক্ষণে ওরা রাজার দলের খুব কাছে এসে গেছে। রানী ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, ত্রিস্তান আমার আর একটা অনুরোধ আছে। তুমি আজই এ দেশ ছেড়ে চলে যেও না। অন্তত

এক মাস লুকিয়ে থেকো এই জঙ্গলে। জানি না, রাজা আমাকে কি চোখে দেখবেন। তিনি এই ছলে ধরে নিয়ে আবার আমাকে শাস্তি দিতে চান। তখন তুমি ছাড়া আর আমাকে অপমান থেকে কে উদ্ধার করবে! যদি সে রকম কিছু হয়, আমি লোক পাঠাবো ঋষির আশ্রমে। আমার শেষ খবর শুনে তবে তুমি যেও।

—সোনালী, আমার শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে তোমাকে কেউ অপমান করতে পারবে না। তোমার খবর না পেয়ে আমি নড়বো না। তুমি নিশ্চিত থেকো।

চিন্তা আমার কোনোদিনই ঘুচবে না ত্রিস্তান। জানিনা ভাগ্য আমায় কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে। কেনই বা আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি? আমরা ভুল করছি না তো? চলো, এখনও আমরা আবার জঙ্গলে ফিরে যাই।

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, না, আর তা হয় না।

আর কথা বলার সময় নেই। ত্রিস্তান রাজার কাছে নতজানু হয়ে প্রণাম করলো। তারপর জমিদার দিনাসকে। তারপর দাঁড়িয়ে ধীরস্বরে বললো, মহারাজ, এই আপনার রানীকে গ্রহণ করুন। গ্রহণ করে এঁকে ফিরিয়ে দিন রানীর সমস্ত সম্মান। যদি রানীর বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ থাকে, আমি তা মুখে অথবা তরবারির সাহায্য উত্তর দিতে প্রস্তুত।

কেউ কোন কথা বললো না দিনাসই এগিয়ে এসে সোনালীর হাত ধরে বললেন, এসো, তুমি আবার আমাদের রানী হও। এই বলে সোনালীর হাত ধরে এনে সঁপে দিলেন রাজার হাতে। রাজা মার্ক রানীর কপালে একটি চুম্বন আঁকলেন। জয়ধ্বনি দিলো প্রজারা। রক্ষীরা বহু-মূল্য পরিচ্ছদ এনে রাখলো রানীর সামনে। সোনালী নিজের পরনের পোশাকের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন সেই ঋষির কথা। চকিতে একবার দেখলেন ত্রিস্তানকে' বললেন থাক্।

তখন দিনাস বললেন, মহারাজ, ত্রিস্তানকে ফিরিয়ে নিন। ত্রিস্তানের মতো বীর আপনার রাজ্যের গর্ব। ত্রিস্তানের সব উপকারের কথা আপনি ভুলে গেলেন?

রাজা চাইলেন সভাসদদের দিকে। সকলেরই মুখে 'না' লেখা আছে।

অনেকেই প্রকাশ্যে বললো, মহারাজ, আর সর্বনাশ ঘরে ডেকে আনবেন না। আমরা ওর নামে কোনো অভিযোগ করছি না। কিন্তু ওর এখন দূরে থাকাই ভালো। কিছুদিন পরে না হয় ডাকবেন ইচ্ছে হলে।

ত্রিস্তান গম্ভীর গলায় বললো, না, আমি এ রাজ্যে আর থাকবো না মহারাজ, আপনি আমাকে গ্রহণ করলেও আমি আর থাকতে রাজী নই। আমি চলে যাবো।—এই বলে, ত্রিস্তান স্থির চোখ মেলে তাকালো সোনালীর দিকে। এত জনতার সামনে, লজ্জায় সোনালী চোখ নামিয়ে নিলেন।

রাজা আর্দ্র গলায় বললেন, ত্রিস্তান, চলেই যখন যাবে, যাও কিন্তু এরকম হত দরিদ্রের মতো ছিন্নভিন্ন পোশাকে তুমি এ রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবে না। আমার ভাণ্ডার থেকে তুমি যে-কোনো পরিচ্ছদ বেছে নিয়ে যাও!

ত্রিস্তান অদ্ভুত ধরনের হেসে বললো, মহারাজ, আপনার কাছ থেকে আমি পোশাক নেবো? না থাক। আমার এই ভালো

এরপর ত্রিস্তান কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলো আর একটিও কথা না বলে বিদ্যুৎ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে যতদূর ত্রিস্তানকে দেখা গেল, সবাই নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। শুধু রানী সোনালী শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়ার ভয়ে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইলেন

## ।। এগারো ।।

রানী ফিরে এসেছে, ত্রিস্তান চলে গেছে। যেন বজ্রভরা মেঘ দূরে সরে গিয়ে ফুরফুর করছে জ্যোৎস্না। রাজা মার্কের রাজ্য এখন সুখের আগার।

সাধারণ মানুষ পাপপূণ্য মানে। পরস্ত্রীকে ভালোবাসা যে মহাপাপ—সে কথা জানে সাধারণ মানুষ। কিন্তু হুজুর, আমাদের মতো কবিরাই শুধু নিয়মহীন। আমরা সম্পর্ক মানি না, আমরা ভালোবাসা মানি। আমরা জানি ভালোবাসা বড় দুর্লভ। নিজের স্ত্রীকেই বা ভালোবাসতে জানে ক'জন লোক? একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালোবাসেন, এর চেয়ে বড় সম্পর্ক আর কি হবে? তাই, প্রৌঢ় রাজা মার্কের পাশে আমি যখন রানী সোনালীকে মনে মনে দেখি, তখন ত্রিস্তানের জন্যে আমার মন কেমন করে। রানী আবার ফিরে পেয়েছেন রানীর সুখ, আর ওদিকে ত্রিস্তান এখনও লুকিয়ে আছে জঙ্গলে—একা শুয়ে থাকে সারাদিন, নাওয়া-খাওয়ায় মন নেই। মাটির ওপর সে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে, গাছের শুকনো পাতা ঝরে ঝরে পড়ে তার গায়।

রাজা মার্কের মনে আর এক বিন্দুও সন্দেহ আর অভিমানের অস্তিত্ব নেই তখন রানীকে তিনি তাঁর ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন রানীও প্রাণপণ সেবায় রাজাকে খুশী করার চেষ্টা করছেন। ত্রিস্তানের নাম আর কেউ উল্লেখ করে না।

একদিন রাজা অসময়ে ফিরে এলেন অন্তঃপুরে। সমস্ত মুখ চোখ লাল। এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রানী এসছিলেন রাজার ধরাচূড়া খুলতে, রাজার গম্ভীর মুখ দেখেই তাঁর বুক কেঁপে উঠলো। তবে কি জানাজানি হয়ে গেছে যে ত্রিস্তান এখনও রাজ্য ছেড়ে যায়নি? ত্রিস্তান কি ধরা পড়লো?

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রানী জিগ্যেস করলেন, মহারাজ, আজ আপনার মন ভালো নেই। রাজ্যে কি নতুন কোনো বিপদ হয়েছে?

রাজা শুকনো হেসে বললেন, না রানী, কিছু তো হয়নি।

—কিন্তু মহারাজ, আপনার মুখের চেহারা কি রকম বদলে গেছে।

—ও কিছু না! এসো আমরা বরং পাশা খেলি দুজনে

—মহারাজ আপনি কি যেন গোপন করছেন। না, বলুন আমাকে।

এদিকে হয়েছে কি, সেদিন সভা শেষ হবার পর সেই তিনজন বদমাস নাইট আবার রাজার কাছে এসেছিল গুজগুজ করতে। তারা বলছিল, মহারাজ, প্রজারা একটা কথা কানাকানি করছে, সেটা আপনাকে না জানিয়ে পারছি না। ওরা বলছে, আপনি বিনা বিচারে একবার রানীকে পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়ে যেমন অন্যায় করেছিলেন, এবারেও তেমনি বিনা বিচারে রানীকে ঘরে তুলে নেওয়া অন্যায়। হাজার হোক, এতদিন পরপুরুষের সঙ্গে থেকে—

—চোপরাও দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। রাজা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, এখনও তোমাদের নিবৃত্তি হয়নি? তোমাদের জ্বালায় প্রাণাধিক ত্রিস্তানকে আমি বিদায় দিয়েছি। এখন রানীকেও আবার সরাতে চাও ত্রিস্তান যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ ডেকেছিল, তখন সাহস ছিল কোথায়? আমি ঢের সয়েছি, আর নয়। দূর হয়ে যাও

—মহারাজ শুধু শুধু রাগ করে তো প্রজাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না। আমরা রানীকে সন্দেহ করছি না কিন্তু রানী যখন সতীই, তখন একবার অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়ালেই তো সব সন্দেহ মিটে যায়—

—অগ্নীপরীক্ষা? আবার তোমাদের ষড়যন্ত্র? দূর হয়ে যাও তোমরা? নইলে—

—মহারাজ রানী অগ্নীপরীক্ষায় দাঁড়াতে রাজী না হলেই লোক সন্দেহ করবে।

—আর একটা কথা বললেই তোমাদের আমি ফাঁসি দেবো।! আমি আর সহ্য করত পারছি না। দূর হয়ে যাও আমার রাজ্য থেকে।

নাইট তিনজন তখন সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মহরাজ, আমাদের নিজস্ব জমিদারী আছে। আমাদের অধীনে নিজস্ব সৈন্য আছে। আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি। আমরা চলেই যাচ্ছি। তবু চলে যাবার আগে বলবো, রানী যখন সতীই, তখন অগ্নীপরীক্ষায় আপনার ভয় কি!

রাজা বললেন, ত্রিস্তান নেই বলেই তোমাদের আজ এত সাহস। আমি বরং ত্রিস্তানকে আবার ফিরিয়ে আনবো। তোমাদের আর মুখ দেখতে চাই না।

নাইটদের বিদায় দিয়েই রাজা রাগত মুখে ফিরেছিলেন। রানী বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন রাজার রাগের কারণ। রাজা কিছুতে বলতে চান না। তখন রানী বললেন, মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে, আমাকে নিয়েই আবার অশুভ কিছু ঘটেছে! মহারাজ, আসামীরও তো অধিকার থাকে তার নামে অভিযোগ শোনার।

রাজা বললেন, রানী ঐ শয়তান নাইটগুলো তোমার সম্বন্ধে আবার কু-কথা বলতে এসেছিল আমি এবার তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি রাজ্য থেকে। সুতরাং আর সে কথা তোমার শোনবার দরকার কি?

—তবু, মহারাজ বলুন, কি কথা ওরা বলেছে?

—না রানী, সে কথা শুনতে চেও না। ওরা অন্যায় কথা বলেছে। আমি ওদের অন্যায়ের শাস্তি দিয়েছি এখন আর তুমি তা শুনে কেন মন খারাপ করবে?

—মহারাজ, আমার মথার দিব্যি, বলুন আপনি

—ওরা তোমাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলছে।

—অগ্নিপরীক্ষা? সেটা কি মহারাজ?

—তোমাদের দেশে এ নিয়ম নেই বুঝি? তোমাদের দেশই ভালো রানী, অগ্নিপরীক্ষা হলো সতীত্বের পরীক্ষা। সতী নারী তাঁর সতীত্বের শপথ করে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে এক খণ্ড লোহা হাতে তুলে নেয়। সত্যিকারের সতীর হাত পুড়ে না! যে মিথ্যা কথা বলে তার হাত পুড়ে যায় এর নাম 'অগ্নিপরীক্ষা'।

রানী একথা শুনে অবনত মুখে বসে রইলেন এ পরীক্ষার কথা শোনার পর আর রাজী না হয়ে থাকতে পারে কোন নারী? সকলেই ভাববে তিনি ভয় পেয়েছেন। তাহলে তিনি বেঁচে থাকবেন কি করে। এ রাজপুরীর সকলেই তাঁকে মনে মনে ঘৃণা করবে তাহলে। সোনালী ধীর স্বরে বললেন, মহরাজ, আমি এ পরীক্ষা দেবো। আপনি ব্যবস্থা করুন

রাজা উত্তেজিত হয়ে বললেন, না না, এ বড় ভয়ঙ্কর যে-কোনো মুহূর্তেই তো কতরকম ভুল হতে পারে? না রানী, তোমাকে অ[illegible] এর মধ্যে যেতে দেবো না।

রানী বললেন, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনিও কি আমাকে বিশ্বাস করেন না? আমি অগ্নিপরীক্ষা দেবো আজ থেকে দশ দিন পর. কিন্তু [illegible]নে নয়, মহারাজ আর্থারের সামনে রাজা আর্থারকে মান্য করে না, এমন লোক পৃথিবীতে কেউ নেই আপনার রাজ্যের পাশেই আর্থারের রাজ্য তার মাঝখানে যে ঝরনা, সেই ঝরণার [illegible] হবে অগ্নিপরীক্ষা আপনি, রাজা আর্থার আর তাঁর বিখ্যাত গোল টেবিলের নাইটদের নিমন্ত্রণ করুন ওদের সামনে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে আর কেউ পরে অবিশ্বাস করতে সাহসী হবে না আর কেউ আমাকে কোন পরীক্ষা দিতে বলবে না

রাজা মার্ক আরও আপত্তি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রানীর জেদ বজায় রইলো। শেষ পর্যন্ত দূত পাঠালেন আর্থারের কাছে। রানীর প্রস্তাবে রাজা মার্ক যে একেবারে খুশীও হননি, তাও নয়। আপনারা জানেন, মানুষের মন কি বিচিত্র!

রানী তখন খুব গোপনে পেরিনিস নামের একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে দিয়ে খবর পাঠালেন ত্রিস্তানের কাছে। বলে পাঠালেন যে, পেরিনিস গিয়ে ত্রিস্তানকে অগ্নিপরীক্ষার সব কথা বলবে। আর বলবে, ত্রিস্তান যেন গোপনে সেখানে উপস্থিত থাকে ছদ্মবেশে। ত্রিস্তান উপস্থিত থাকলে, রানী কোনো পরীক্ষাতেই ভয় করেন না।

রাজা মার্ক নির্দিষ্ট দিনে রানী এবং বহু অনুচর সঙ্গে নিয়ে এলেন সেই ঝরনার পাশে। ঝরনার ওপাশে রাজা আর্থারের তাঁবু। সিংহাসনে বসে আছেন রাজা আর্থার, আর পৃথিবী বিখ্যাত নাইটরা রয়েছেন তাঁকে ঘিরে। সামনে আগুন জ্বলছে, সেখানে অগ্নিপরীক্ষা হবে।

ঝরনার অন্য দিকটা অন্য রাজ্য, সুতরাং অনুচররা, সৈন্যসামন্তরা যেতে পারবে না। অনুচরেরা সবাই ঝরনার এ পাশে রইলো। শুধু রাজা মার্ক রানীকে নিয়ে একটা নৌকায় চড়ে এলেন এপারে। নৌকো যখন পারে লাগলো, তখন পাড়ের সামনে সামান্য কাদা দেখে রানী বললেন, মহারাজ এখানে নামতে গেলে আমার কাপড় ভিজে যাবে। পায়ে কাদা লাগবে। আমি শুদ্ধভাবে পরীক্ষা দিতে চাই। আমাকে নৌকো থেকেই পাড়ে নামাবার ব্যবস্থা করুন।

পাড়ের কাছে অসংখ্য ভিক্ষুকের সঙ্গে বসে ছিল একজন তীর্থ-যাত্রী। লোকটির মলিন ছিন্নভিন্ন পোশাক, মুখে এক মুখ দাড়ি, চুল ধুলোমাখা আঠা! কিন্তু লোকটা বেশ লম্বা আর শক্ত সমর্থ জোয়ান। ভিড়ের মধ্যেও তাকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে। সে দাঁড়িয়েছিল একবারে ঝরনার পাশে। মার্ক তাকেই বললেন, ওহে, তুমি রানীকে চেয়ারসুদ্ধ তুলে পাড়ে নামিয়ে নিতে পারবে? যথেষ্ট ইনাম পাবে। শক্তি আছে তো?

হ্যাঁ, হুজুর। নিশ্চয়ই পারবো।

লোকটি এসে অবলীলাক্রমে চেয়ারসুদ্ধ রানীকে তুলে নিল। তারপর যখন সে জলে পা নিয়েছে, তখন, রানী মুখ নিচু করে খুব আস্তে বললেন, ত্রিস্তান।

তীর্থযাত্রী পলকের জন্য মুখ তুলে তাকালো রানীর দিকে।

রানী তক্ষুনি অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। তারপর বললেন, কি, তুমি ঠিক পারবে তো? তোমার পা কাঁপছে কেন? ফেলে টেলে দেবে নাকি?

তীর্থযাত্রী বললো, না, রানীমা ঠিক পারবো। অনেকদিন ব্রত করে উপবাসী আছি, তাই শরীরটা একটু দুর্বল।

রানী এবার আরও আস্তে বললেন, পথিক, আমাকে পাড়ে নামাবার সময় তুমি খুব সাবধানে নামাবে। খুব সাবধানে, বুঝেছো তো?

সে খুব আলতোভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

পাড়ে এসে চেয়ারটাকে নামাবার সময় তীর্থযাত্রী হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল চেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করে। পড়ে যেতেই রানী ভয়ে লোকটিকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু এক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালেন।

রাজা লোকটির হটকারিতায় ছুটে এসে পায়ের ঠোক্কর দিয়ে বললেন, হতভাগা, সামর্থ নেই, তবে রাজী হলি কেন? প্রহরীরা এসে লোকটিকে মারতে লাগলো—রানীকে ফেলে

দেওয়া, এতবড় সাহস! নিজের পোশাক ঠিক করতে করতে রানী করুণাঢালা গলায় বললেন, আহা গরীব লোক খেতে না পেয়ে বোধহয় দুর্বল হয়ে গেছে। ওকে মেরো না তোমরা। ছেড়ে দাও। এই নাও তুমি—রানী লোকটির দিকে একটি স্বর্ণমুদ্রা ছুঁড়ে দিলেন। মার খেয়ে লোকটি একটি কথাও বলেনি, মুদ্রাটি তুলে নিয়ে এবার ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

রানী একে একে তাঁর কানের দুল, হাতের চুড়ি, সর্বাঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলে দান করলেন সমবেত ভিখারীদের। তারপর নিজের বহুমূল্য বসনও একে একে খুলে দান করলেন। রানীর পরনে রইলো শুধু পাতলা একটা সাদা সেমিজ। রানীর অমন শ্বেত হংসীর মতো লীলায়িত রূপসী শরীর, শুধুমাত্র একটি স্বচ্ছ পোশাকে যেন শিল্পী হিসেবে প্রমাণ করলো ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মধ্যে কোনো শিল্পী আজ পর্যন্ত ওরকম রূপের সৃষ্টি করতে পারেনি।

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। তার মধ্যে অনেকক্ষণ পুড়ে পুড়ে একখণ্ড লোহা টকটকে লাল হয়ে আছে। রানীর সর্বশরীর কাঁপছে। তবু তিনি অচঞ্চল পায়ে এগিয়ে এলেন। প্রণাম করলেন অগ্নিকে। তারপর অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, দুই দেশের নৃপতি, সমবেত বীরবৃন্দ ও দর্শকগণ! আপনাদের সামনে আজ আমি আমার সত্যের পরীক্ষা দেবো। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে দেখছেন; তিনি সব সময় সত্যের পক্ষে। মহামান্য সম্রাট আর্থার, আপনি শুনুন, এই আমার সতীত্বের শপথ: আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আজ পর্যন্ত কোনো পুরষ আমাকে ছোঁয়নি বা আমি কারুকে ছুঁইনি—একমাত্র আমার স্বামী রাজা মার্ক, আর হ্যাঁ আর একজন– এইমাত্র যে দেখলেন–ঐ গরীব তীর্থযাত্রী আমাকে ফেলে দিয়েছিল–আমি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম, ওকে ছাড়া আর কারুকে কখনও স্পর্শ করিনি। ঈশ্বর আমার সাক্ষী। আমি অন্তর থেকে এই সত্য উচ্চারণ করছি। যদি সত্যের যথার্থ মর্যাদা থাকে—তবে আগুনও তাকে পোড়াতে পারবে না।

রানী এবার রাজা মার্কের দিকে ফিরে বললেন, মহারাজ, এই শপথই কি যথেষ্ট? উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় রাজা মার্ক কথা বলতে পারছিলেন না। ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন। রানী তবু বললেন, আপনি আপনার প্রজাদেরও প্রশ্ন করুন, তারা আমার এই অঙ্গীকার মেনে নেবে কিনা। রাজা তখন নদীর অন্য পারে অপেক্ষারত তাঁর দেশবাসীদের উচ্চকণ্ঠে রানীর শপথের কথা শোনালেন। তারা সম্মতি জানালো তৎক্ষণাৎ।

রানী এবার আগুনের আরও কাছে এগিয়ে এলেন। এখন আর তাঁর শরীর কাঁপছে না। তিনি আবার বললেন, হে অগ্নি, আমার স্বামী এবং এ তীর্থযাত্রী এই দুজনকে ছাড়া আমি আর কারুকে কখনো স্পর্শ করিনি। এই আমার সতীত্ব।—তারপর, বিনা দ্বিধায় আগুনের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিনি লোহার টুকরোটা তুলে নিলেন। সবদিক ঘুরে সকলকে উঁচু করা নিজের হাত দেখালেন। তারপর, লোহাটা ফেলে দিয়ে প্রথমেই স্বস্তিবাচক ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন নিজের বুকে। হাতের মুঠো খুললেন। পরিষ্কার, অক্ষত সেই নবনীত হাত। একটু ছাইয়ের মলিনতাও লাগেনি। জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। রানীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক।

মহান রাজা আর্থার সিংহাসন ছেড়ে উঠে বললেন, আমি এই নারীর সতীত্বের সাক্ষী রইলাম। মা, আর কোনো দুষ্ট লোক যদি তোমাকে কখনও সন্দেহ করে, আমার তরবারী তাকে শাস্তি দেবে।

## ।। বারো ।।

ত্রিস্তান আবার ফিরে এসেছে জঙ্গলে। এবার তাকে চলে যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে। রাজার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। সোনালীরও আর কোনো ভয় নেই, এখন সে সন্দেহের উর্ধ্বে।

দু-তিন দিন কেটে গেল, তবু ত্রিস্তানের যাওয়া হয় না। একা একা সে সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে শুয়ে থাকে। শিকারে বেরুতে ইচ্ছে করে না, তাই অনেক সময় খাওয়া হয় না। শুয়ে শুয়ে সে ভাবে, সেই ঝরনার পাশে শেষবার সোনালীর পাখির মতো দেহ কয়েক মুহূর্তের জন্য তার বুকে এসেছিল। সোনালীর সুডৌল দুই বুক লেগেছিল তার বুকে, তাঁর উত্তেজনার স্পন্দন ত্রিস্তান অনুভব করেছিল। এখনও যেন সোনালীর শরীরের সৌরভ ত্রিস্তান দেহে লেগে আছে। এই নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ত্রিস্তান পড়ে থাকে। তার হাতে, সোনালীর দেওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রা।

রোজই ভাবে ত্রিস্তান, আজ চলে যাই। কিন্তু, আজ এমন চড়া রোদ, আজ কি যাওয়া যায়? পরের দিন ভাবে, ইস, আজ এমন মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, আজ তো যাওয়া উচিত নয়। যাবার জন্য পা আর ওঠে না। কি এক প্রবল আকর্ষণ তাকে টেনে রাখে।

এমনি করতে করতে একদিন জ্যোৎস্না রাতে ত্রিস্তান সত্যি বেরিয়ে পড়লো ঘোড়া নিয়ে। বন পেরিয়ে এলো সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো, আর দেখা হবে না। এ জন্মের মতো বিদায়, আর দেখা হবে না। একবার শেষ দেখা?

হঠাৎ ত্রিস্তান ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল টিন্টাজেল দুর্গের দিকে। বাইরে ঘোড়া বেঁধে দেয়াল পেরিয়ে এলো। তখন সে যেন অন্ধ, তার কোনো বাধা নেই, কোনো ভয় নেই। আগেকার সেই মিলনকুঞ্জে দাঁড়িয়ে ত্রিস্তান পাখির মতো শিস দিতে লাগলো।

রাজার পাশে শুয়ে শুয়ে কোনো দিনই রানীর ভালো করে ঘুম আসে না। হঠাৎ শুনলেন পাখির ডাক। একটা পাখি যেন কাঁদছে। তার করুণ সুর কেঁপে কেঁপে উঠছে হাওয়ায়। রাত্রির বেলা কোন পাখি ডাকে? রানী ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ তার শরীর কেঁপে উঠলো। এ তো ত্রিস্তান! বনের মধ্যে ত্রিস্তান তাকে এই সুর শোনাতো। কি করুণ তার ডাক। যেন বসন্তের শেষে কোকিল তার শেষ ডাক ডেকে নিচ্ছে।

রানী মনে মনে বললেন, ত্রিস্তান, কেন ডাকছো এমন ভাবে? আমরা যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঋষির আশ্রমে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, আর দেখা হবে না। আবার দেখা মানেই তো মৃত্যু মৃত্যু? আসুক মৃত্যু! ত্রিস্তান তুমি ডেকেছো। আমি যাবো।

রানী ধড়মড় করে উঠে বসলেন, তারপর ঘুমন্ত রাজার পাশ থেকে নিঃশব্দে নেমে এলেন। কোনোদিক দৃকপাত না করে সোজা চলে এলেন বাগানে। বিস্রস্ত বেশ আলুলায়িত চুল, রানী ছুটে গেলেন ত্রিস্তানের দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রিস্তানের বুকে।

একটিও কথা না বলে ওরা দুজনে পাগলের মতো দুজনকে চুমু খেতে লাগলো। ত্রিস্তান রানীর সমস্ত শরীরে হাজার হাজার ফুলের মতো চুমুতে ভরিয়ে দিল, পদতল পর্যন্ত। তারপর রানী ত্রিস্তানকে আলিঙ্গন করে বললেন, ত্রিস্তান, আমায় জড়িয়ে ধরো। আমাকে এমনভাবে জড়াও যেন এখুনি তোমার বুকের সঙ্গে মিশে যাই। এই রাতই হোক পৃথিবীর শেষ রাত ত্রিস্তান!

ত্রিস্তান আর সোনালীর শরীর এক হয়ে মিশে গেল।

সেই কুঞ্জেই ওদের রাত্রি ভোর হলো। সূর্যের আলোয় বনের একটি ফুলও ফোটার আগে, জেগে উঠলো ওরা দুজনে। ত্রিস্তান বুঝলো, এবার সত্যিই তাকে যেতে হবে। সেই রাতই তাদের জীবনের শেষ রাত হয়নি। এখনও অনেক দিন ও রাত্রির রহস্যময় খেলা

বাকি আছে। সোনালীকে আবার চুম্বন করে ও বললে, সখী, আমি যাবার সময় কী সঙ্গে নিয়ে যাবো তোমায়!

রানী বললেন, ত্রিস্তান, আমার শরীর রইলো এখানে, তুমি আমার আত্মা নিয়ে যাবে।

—সোনালী, তোমার সবুজ আংটি দিয়ে কোনো লোককে পাঠিয়ে আমি যদি কোনো অনুরোধ জানাই, তুমি শুনবে তো?

—ত্রিস্তান, যদি কখনো তোমার ডাক শুনি, রাজবাড়ির হাজারটা দেয়ালও আমাকে আটকাতে পারবে না। ত্রিস্তান, তুমি জেনে রেখো, এখানে আমার একটি দিনও সুখে কাটবে না।

এই সময় রাজপুরীতে বেজে উঠলো ভোরের শানাই। ত্রিস্তান আর একটিও কথা না বলে নিঃশব্দে রানীকে চুম্বন করে উঠে চলে গেল।

এরপর অনেক দিন দিশাহারার মতো ত্রিস্তান ঘুরলো নানান রাজ্যে। কোথাও তার শান্তি নেই। কোথাও যদি কোনো যুদ্ধের খবর শোনে, ত্রিস্তান কোনো এক পক্ষ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই যুদ্ধে। ওর সমস্ত শরীরে জ্বালা। কোনো যুদ্ধে ওর মৃত্যু হোক তাই ও চায়। কিন্তু মরণ অত সহজে আসে না। বরং দুর্ধর্ষ বীর হিসেবে ত্রিস্তানের নাম রটে যায় আরো।

ঘুরতে ঘুরতে ত্রিস্তান এলো নিজের রাজ্য লিওনেস! সত্যবাহন রোহল্ট তাকে প্রচুর সম্মান করে বরণ করে নিল প্রভুর মতো। তাকে ছেড়ে দিল রাজপ্রাসাদ, ফিরিয়ে দিল রাজসম্মান। কিন্তু ত্রিস্তানের রাজ্যলিপ্সা নেই। দীর্ঘদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে সুখভোগেও তার অরুচি এসে গেছে। ভ্রাম্যমান হবার জন্য তার রক্ত ছটফট করে। আবার সে বেরিয়ে পড়লো।

মাঝে মাঝে যখনই সে কর্নওয়ালের কোনো বণিক বা পথিককে দেখে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে সে দেশের খবর। সবার মুখেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ওরকম শান্তিময় দেশ আর হয় না, আর অমন সুন্দর যে দেশের রাজা রানী! মাঝে মাঝে রানী যখন পথ দিয়ে যান, তখন সারা শহরের মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে ওদের দেখে। রানী সোনালী যেন রাজ্যের লক্ষ্মী। অমর প্রাণচঞ্চলা, সকলের সঙ্গে সমান হাসিমুখে ব্যবহার—এমন রানী কে কবে দেখেছে?

ত্রিস্তান ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করে, রানী খুব সুখী?

বাঃ, সুখী হবেন না? অত সৌভাগ্য? কিসের অভাব তাঁর? একদিনের জন্যও কেউ রানীর মুখ গম্ভীর দেখেনি।

সুখী? ত্রিস্তান দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সুখী হবেই তো, আস্তে আস্তে সে ত্রিস্তানের কথা ভুলে যাবে। রানী জানেই না হয়তো, আমি বেঁচে আছি কিনা। জানার তার ইচ্ছেও নেই বোধহয়।

এই দুঃখকে ভোলার জন্যই ত্রিস্তান আবার পাগল হওয়ার মতো ঘুরতে লাগলো এক দেশ থেকে আর এক দেশ। কোথাও সে টিকতে পারে না। সূর্যের আলো তার অসহ্য লাগে, জ্যোৎস্না তার শরীর পুড়িয়ে দেয়। অন্ধকার তার গলা টিপে ধরে। এক মুহূর্তের জন্যেও ত্রিস্তানের নিস্তার নেই। আর ক্রমাগত সে লোকের মুখে শোনে কর্নওয়ালের রানী সোনালী কি সুখী, ভাগ্যবতী। পয়মন্তে রাজ্যের সমৃদ্ধি উছলে উঠছে।

একদিন একটা বন পেরিয়ে এসে ত্রিস্তান একটি দুর্গের সামনে দাঁড়ালো। তখন বিকেল বেলা, ত্রিস্তান সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে ক্লান্ত। ভাবলো, দুর্গে একটু আশ্রয় পাবে। কিন্তু দুর্গটা একটু অদ্ভুত! দুর্গের সামনে সমস্ত জঙ্গল আগুনে পোড়ানো। দুর্গের দেয়ালেও আগুনের আঁচ লেগেছিল। তখনও দিনের আলো আছে অথচ দুর্গের দরজা বন্ধ। কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই ত্রিস্তান ঘোড়া থামালো একেবারে দুর্গের দরজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের কাছে এসে দুটো বর্শা পড়লো।

ত্রিস্তান হাত তুলে বললো আমি শত্রু নই। আমি বিদেশী, অতিথি। এক রাত্রির জন্য আশ্রয় চাই।

সঙ্গে সঙ্গে যেন শত কণ্ঠে গর্জে উঠলো, আমরা কোনো বিদেশী অতিথি চাই না।

ত্রিস্তান আবার বলে উঠলো, আমি ক্লান্ত, আমাকে এক রাত্তিরের জন্য আশ্রয় দেবে না?

এইবারে দুর্গের একটা জানালা খুললে দেখা গেল একটা যুবাপুরুষের মুখ। সুপুরুষ, দীর্ঘকান্ত। যুবকটি বললো, তুমি বন্ধুই হও আর শত্রুই হও, আমাদের দুর্গে কারুকে আশ্রয় দেবার উপায় নেই।

—কেন? ত্রিস্তান জিগ্যেস করলো।

—আমরা দু'মাস ধরে অবরুদ্ধ হয়ে আছি এই দুর্গে। শত্রুরা আমাদের ঘিরে আছে। দুর্গে আমাদেরই খাদ্য নেই, অতিথির সেবা করব কি করে?

আমি লিওনেসের ত্রিস্তান। আমাকে অন্তত এক রাত্তিরের জন্য আশ্রয় দিন। হয়তো আমি আপনাদের কোনো কাজেও লাগতে পারি।

ত্রিস্তানের নাম শুনে যুবকের মুখে সম্ভ্রমের চিহ্ন দেখা গেল। সে বললো, আমি আপনার বীরত্বের খ্যাতি শুনেছি; কিন্তু আপনি কেন আমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন।

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, কোনো অবস্থাই আমার কাছে আর দুর্ভাগ্য নয়! আপনি দরজা খুলুন।

দুর্গের দরজা খুলে গেল। সেই যুবক ত্রিস্তানের হাত ধরে বললো, আমার নাম কাহারডিন। আমি ছিলাম ব্রিটানির রাজকুমার। আজ রাজ্য হারিয়ে শুধু এই দুর্গটাই আমাদের সম্বল। তাও এটা কতদিন রাখতে পারবো জানি না।

—কে এই অবস্থা করলো?

—আমাদেরই এক ভৃত্য। সে আমার বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আমরা রাজী হইনি বলে, সে বিদ্রোহ করে। সে আজ মহাশক্তিশালী। কিন্তু প্রাণ থাকতে আমি আমার বোনের সঙ্গে ভৃত্যটার বিয়ে দেবো না।

কাহারডিন ত্রিস্তানকে নিয়ে গেল একেবারে অন্তঃপুরে। সেখানে ওর বাবা মা বোন সকলেই নত মস্তকে বসে আছেন। ত্রিস্তানের ছিপ্‌ছিপে, দীর্ঘ, সুকুমার চেহারার দিকে সকলেই তাকিয়ে রইলো বিস্ময়ে। কাহারডিন ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ত্রিস্তানের। রাজকুমারী—যাকে কেন্দ্র করেই এ রাজ্যের এত দুর্ভাগ্য, মুখ নিচু করে উল বুনছেন। তার রূপের আলোয় ঘর ভরা, কিন্তু একটু যেন তীব্র আর প্রখর সেই রূপ। কাহারডিন বললো, এই আমার বোন রূপালি ইসল্ট। আমরা ওকে রূপালি বলে ডাকি।

নাম শুনে চমকে উঠলো ত্রিস্তান! মনে পড়লো বহুদিন আগে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজকুমারীর নাম শুনেছিলাম, সোনালী চুল ইসল্ট। আর আজ এখানে অন্য এক রাজকুমারী, রূপালি ইসল্ট। সোনালী বিপরীত রূপালি। তার ভাগ্যও কি এবার বিপরীত দিকে যাবে? ত্রিস্তান দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, কোথায় সোনালী? সে তো আমাকে ভুলে গিয়ে সুখে আছে।

ত্রিস্তান বললো, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

সামান্য বজরার রুটি আর খানিকটা তরকারী খেতে দেওয়া হলো ওকে। মাছ, মাংস বা ডিম নেই। এই কি রাজপরিবারের খাদ্য? বিদ্রোহীরা জঙ্গল ঘিরে রেখেছে—দুর্গ থেকে বেরিয়ে কেউ খাবার আনতে পারে না।

যদি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এরা রাজকুমারীকে দিয়ে দিতে রাজী হয় সেই জন্যই বিদ্রোহীরা দুর্গ শুধু অবরুদ্ধ করে রেখেছে, ধ্বংস করছে না। ত্রিস্তান তাকিয়ে দেখলো, রাজকুমারী রূপালি নিঃশব্দে বসে উল বুনছেন।

ক্লান্ত ত্রিস্তান সেদিন ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে উঠেই কাহারডিনকে বললো, চলো আমার সঙ্গে! খাদ্য লুট করে আনি!

কাহারডিন বললো, ত্রিস্তান, আমাদের দুর্গে মাত্র তিনশো সৈন্য আর ওরা অন্তত দশ পনের হাজার। গিয়ে কি লাভ।

ত্রিস্তান বললো, তুমি রাজপুত্র, নিশ্চয়ই যুদ্ধে মরতে ভয় পাও না। এসো আমার সঙ্গে।

অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওরা দুজনেই বেরিয়ে পড়লো। নিঃশব্দে চললো বনের ছায়ায় ছায়ায়। কিছুদূর গিয়ে একটা বড় গাছের ওপর উঠে বসে রইলো দুজনে। ত্রিস্তান দেখলো দূরে বিদ্রোহীদের তাঁবু। বাইরে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে রোদ্দুরে ঝলমল করছে তাদের অস্ত্র। না, ত্রিস্তানের সাধ্য নেই একা সেখানে গিয়ে কিছু করে। ত্রিস্তান বললো, আমাকে চিনিয়ে দিতে পারবে, কে তোমাদের বিদ্রোহী দাস।

পাতার আড়াল থেকে কাহারডিন আঙুল তুলে দেখালো, ঐ যে দেখছো যার গায়ে মখমলের পোষাক, মোষের মতো চেহারা, ঐ আমাদের দাস রিওল! লোকটা অসম্ভব শক্তিশালী।

ত্রিস্তান রিওলকে চিনে রাখলো। খানিকটা বাদে শুনলো দূরে বনের মধ্যে গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ। একটা ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই করে মাংস আর মদ আসছে এই সৈন্যদের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে আসছে কুড়ি পঁচিশ জন প্রহরী। ত্রিস্তান কাহারডিনকে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো তারপর সে আকস্মিক ঝড়ের মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রহরীদের উপর। তার তলোয়ার ঘুরতে লাগলো প্রচণ্ড বেগে। ত্রিস্তান যেন একাই পঁচিশ জন লোক হয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্তে সে প্রহরীদের হত্যা করে—কাহারডিনকে সংগে তুলে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। ওদিকে সৈন্যরা টের পাবার আগেই ওরা দুর্গে পৌঁছে গেছে!

সেদিন দুর্গে অনেকদিন পর বিরাট ভোজ হলো। সৈন্যরা প্রাণভরে উৎসব করলো—আর জয়ধ্বনি তুললো ত্রিস্তানের নামে।

সেদিনই মধ্যরাতে দুর্গ আক্রান্ত হলো। রিওলের সৈন্যরা দুর্গের চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে—বিরাট একটা কাঠের গুড়ি দিয়ে দুর্গের দরজায় আঘাত করে ভেঙে ফেলেছে। দুর্গের সৈন্যরা প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে। ত্রিস্তান তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালের ওপর। সে তখনও যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

হঠাৎ সে দেখলো একটা বিরাট মই ফেলে পিলপিল করে সৈন্য উঠে আসছে দুর্গের ছাদে। তখন শুরু হলো হাতাহাতি লড়াই। যুবরাজ কাহারডিন লড়াই করছে একজন ভীষণ-দর্শন যোদ্ধার সঙ্গে। যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে লড়াই করছে কাহারডিন, একসময় লোকটির বুকের মধ্যে তলোয়ার বসিয়ে দিল। এমন সময় যমদূতের মতো রিওল এসে দাঁড়ালো তার সামনে। এবার অট্টহাসি দিয়ে বললো রাজকুমার, আমার ভাইকে তো মারলে। আমার সঙ্গে একহাত হোক।

তখন ত্রিস্তান একলাফে হাজির হলো সেখানে। বললো, রাজপুত্র কখনও ভৃত্যের সঙ্গে লড়াই করে না! আগে ভৃত্যের সঙ্গে ভৃত্যের লড়াই হোক।

এ লোকটা আবার কে? এই বলেই রিওল বিদ্যুৎবেগে তলোয়ার চালালো ত্রিস্তানের দিকে। ঠক করে ত্রিস্তানের তলোয়ারের সঙ্গে তার তলোয়ার আটকালো। ওরা দুজনে মুখোমুখি। এ সময় তক্ষে য়ার টেনে নেওয়া বিপদ। যার বাহুর জোর—সেই জিতবে। শারীরিক

শক্তিতে ত্রিস্তান রিওলের সঙ্গে পারবে না। ত্রিস্তান নিচু হয়ে বসে পড়ে তলোয়ার খুলে নিল। ঝোঁক সামলাতে না পেরে রিওল হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ত্রিস্তান তখন দ্রুত ছুটে গিয়ে উঠলেন দুর্গের সর্বোচ্চ চূড়ায়। রিওলও ক্রুদ্ধভাবে ছুটে গেল সেখানে। তারপর সেখানে যুদ্ধ হতে লাগলো দুজনের। ঠং ঠং শব্দ হচ্ছে তলোয়ারের। আকাশের পটভূমিকায় ওদের সেই লড়াই, চারপাশের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে—এ এই এমনই এক দৃশ্য যে, বহু লোক যুদ্ধ থামিয়ে দেখতে লাগলো ওদের।

ত্রিস্তানের শরীরে বর্ম নেই, হালকা দেহ—সে ক্ষিপ্রভাবে সরে যাচ্ছে আঘাতের সময়। রিওল—বিশাল ভারী। তার ভরসা—শারীরিক শক্তি। এক ফাঁকে ত্রিস্তান তলোয়ার চালিয়ে রিওলের বুকের বর্ম ফাঁক করে দিল। তারপর ত্রিস্তান রিওলের কব্জির কাছে এমন কৌশলে আঘাত করলো—যে তার হাতের দুটো আঙুল কেটে গিয়ে তলোয়ারটা ছিটকে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়লো দূরের বনের মধ্যে। ত্রিস্তান রিওলের বুকে তলোয়ার ছুঁইয়ে বললো, শেষবার ভগবানের নাম করে নাও।

যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ, রিওল মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, আমার প্রাণ ভিক্ষে দাও।

ত্রিস্তান হাসলো। হেসে বললো, ভিক্ষে চাইবার সময় মানুষের আর সময় অসময় জ্ঞান থাকে না! দু'মিনিট আগে তোমার মুখ অহংকারে টক্‌টক্ করছিল। আর এই মুহূর্তে সত্যি ভিখারীর মতো করুণ হয়ে গেল। আচ্ছা, তোমায় ভিক্ষা দিচ্ছি, তার আগে তুমি চেঁচিয়ে তোমাদের সৈন্যদের বলো যুদ্ধ থামাতে। সকলের সামনে শপথ করো, তুমি আবার এ রাজপরিবারের দাসত্ব করবে। রাজকুমারের ঘোড়ার আগে আগে তুমি যাবে পায়ে হেঁটে।

রক্তাক্ত হাত জোর করে, রিওল চিৎকার করে তার সৈন্যদের ডাকলো। সকলে অবাক হয়ে দেখলো যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত। তার বুকের কাছে উঁচু করা ত্রিস্তানের তলোয়ার। রিওল কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি হেরে গেছি। আমি হেরে গেছি। যুদ্ধ শেষ। ত্রিস্তানের আদেশে শৃঙ্খলিত করা হলো তাকে। সে আবার এ রাজবাড়ির দাসত্ব করতে স্বীকার করলো।

ত্রিস্তান ভাবলো, এবার তার কাজ শেষ, আবার তাকে অন্য দেশে চলে যেতে হবে। ততক্ষণে কাহারডিন এসে ত্রিস্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, ত্রিস্তান, তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তোমাকে আর আমি ছাড়বো না। কাহারডিন ত্রিস্তানকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বৃদ্ধ পিতার কাছে।

রাজা তার মস্তক আঘ্রাণ করে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে করতে বললেন, কোথা থেকে তুমি এলে সৌভাগ্যের দূত! আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলে। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তুমি আমাদের রাজ্যের স্থায়ী রক্ষক হলে। বৎস ত্রিস্তান, তুমি আমার মেয়ে রূপালীকে বিয়ে করো। সে তোমার অযোগ্য হবে না।

ত্রিস্তান চুপ করে রইলো। অভিমানে তার বুক দুলছে। মন বললো, সোনালী, সোনালী। সোনালী আমাকে ভুলে গেছে। আমাকে হারিয়েও সে সুখী। আমি বেঁচে আছি কিনা তা সে জানতেও চায় না।

কাহারডিন ব্যগ্রভাবে বললো, ত্রিস্তান, আমার বোন সত্যিই তোমার যোগ্য। আমরা তোমাকে আত্মীয় হিসেবে চাই

ত্রিস্তান তবুও চুপ।

ত্রিস্তান চুপ করে আছো কেন, সাড়া দাও।

ত্রিস্তান শুধু বললো, না।

বৃদ্ধ রাজা ধীরভাবে বললেন, ত্রিস্তান আমাদের ভৃত্য রিওল লোভ করেছিল রুপালিকে। আমাদের সবশকে হত্যা করার আগে সে রুপালিকে অপহরণ করতে পারত না। কিংবা তখনও সে পেতো রুপালির মৃতদেহ। কিন্তু তুমি তাকে পরাজিত করে রুপালিকে উদ্ধার করেছো। রুপালি এখন আইনত তোমার। নারী সব সময়েই বীরভোগ্য এবং বীর্য শুল্কা। তোমার বীরত্বে তুমি রুপালির অধিপতি হয়েছ। তুমি যদি তাকে পরিত্যাগ করো, তবে তার আর কোনো উপায় থাকবে না।

কাহারডিন আবার বললো, ত্রিস্তান, বন্ধু, রুপালিকে তোমার পছন্দ নয়? ঐ দেখো, দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি ওকে আরেকবার দেখো!

ত্রিস্তান চোখ তুলে তাকালো সেদিকে। দরজার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন রুপালি। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেই রূপ। একমাথা রুপালি চুল, উজ্জ্বল মসৃন মুখ, দীর্ঘ শরীর, একটা সাদা সিল্কের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন মোমবাতির আলোর মতন তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি স্নিগ্ধ কিন্তু বড় বিষণ্ণ।

রুপালির দিকে তাকিয়ে ত্রিস্তানের তবু মনে পড়লো সোনালীর কথা। যে কোনো জায়গায় কোনো সুন্দর রূপ দেখলেই সে সোনালীর কথা ভাবে। যখন সে কোনো ভালো খাদ্য খায়, দেখে কোনো সুগন্ধ ফুল, কোনো হরিণশিশু অথবা যখন আকাশ ভাসিয়ে জ্যোৎস্না ওঠে, কিংবা সে শোনে ঝরনার ছলছল শব্দ—সবই তাকে সোনালীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এ পৃথিবীর সব সৌন্দর্যই তার চোখে সোনালী।

কিন্তু অভিমানে ত্রিস্তানের বুকে জ্বালা করতে লাগলো। কোথায় সোনালী? সে আমাকে ভুলে গেছে। রাজাকে নিয়ে সুখে আছে! বনে জঙ্গলে আমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করার পর এখন সে পেয়েছে সুখের স্বাদ। আমি তার কেউ নই! শুধু আমিই কি তার স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়াব জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো? না—না! ত্রিস্তান আবার তাকালো রুপালির দিকে। একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে, যেন সেই দীর্ঘশ্বাসই তার এক জন্মের স্মৃতি।

তারপর মৃদুস্বরে বললো, রুপালিকে বিয়ে করতে পারা তো আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

হায়, ত্রিস্তান, তুমি কেন এ কথা বললে? প্রভু, আপনারা এ কাহিনী শুনেছেন, আপনারা ত্রিস্তানের দুঃখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলুন। হায়, হায়, তুমি এ কি করলে? সেদিন থেকেই যে ত্রিস্তানের মৃত্যু শুরু হয়ে গেল। ত্রিস্তানের সঙ্গে সোনালীর জীবন—ভালোবাসা ও মৃত্যু—এক সূত্রে বাঁধা। ভালোবাসার একমাত্র বিপরীত জিনিস যে মৃত্যু। আর কিছু নেই। হায় ত্রিস্তান, তোমার অভিমান তোমাকে সর্বনাশের মধ্যে নিয়ে গেল!

কয়েকদিন পর মহা ধূমধামের সঙ্গে বিয়ে হলো। বহুকাল পরে এ রাজ্যে আনন্দ ফিরে এসেছে। বহুকাল পর ত্রিস্তান বহুমূল্য উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরেছে। তাকে দেখাচ্ছে দেবতার মতো আর রাজকুমারী রুপালি, সলজ্জ সুন্দরী—তার রূপের দিকে তাকালেও চোখের পলক পড়ে না! রুপালি আস্তে আস্তে ত্রিস্তানের হাতে একটা আংটি পরিয়ে দিলেন। টক্‌টকে লাল পাথরের আংটি। সেদিকে তাকিয়ে ত্রিস্তানের চোখ পড়লো নিজেরই হাতের অন্য আঙুলে সবুজ পাথরের আংটির দিকে। সোনালী তাকে দিয়েছিল, অভিজ্ঞান হিসেবে।

হঠাৎ ত্রিস্তানের মাথা ঘুরে উঠলো। যেন সে তখুনিই অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখুনি তার এক নিমেষের মধ্যে মনে পড়ে গেল—বনে বনে সোনালীর সঙ্গে তার দুঃখ ভাগ করে নেওয়া দিনগুলির সম্পূর্ণ ছবি! সোনালীর পাশে বসে তার সেই পাখির ডাক শোনানো মুহূর্তে ত্রিস্তান নিজের ভুল বুঝতে পারলো। এ কি করেছে সে? সোনালী ছাড়া অন্য নারীকে সে

ছোঁবে কি করে? তার এক জীবনের সম্পূর্ণ ভালোবাসা যে সে আগেই দিয়ে দিয়েছে সোনালীকে। এখন তার কিছু অবশিষ্ট নেই!

ফুলশয্যার রাত্রে দুজনে শুয়ে আছে পাশাপাশি। ত্রিস্তান রুপালির অঙ্গে একবার হাতও ছোঁয়ায়নি, একটি কথাও বলেনি। একি ফুলশয্যা! আহা, সরল নির্দোষ রুপালি। নিঃশব্দে প্রতি মুহূর্ত কাটছে। খানিকটা পর রুপালি খুব মৃদুভাবে বললেন, আর্যপুত্র, আমি কি কোনো দোষ করেছি? আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

—না, না, না।

—তবে, আপনি আমার সঙ্গে একটাও কথা বলছেন না? আমি কি দোষ করেছি, বলুন? আমাকে কি আপনার পছন্দ হয়নি?

—না, রুপালি, আমাকে ভুল বুঝো না। আমার একটি শপথ আছে। একবার আমি যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হয়েছিলাম। আমার বাঁচার কোনো আশা ছিল না। তখন আমি কুমারী মেরির কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, মা আমাকে যদি বাঁচিয়ে দাও, আমি বিবাহের পর এক বছর ব্রহ্মচার্য পালন করবো। আমার স্ত্রীকে আলিঙ্গন, চুম্বনও করবো না। আমাকে এক বছর সেই প্রতিজ্ঞা রাখতে দাও। আমায় ক্ষমা করো, রাজকন্যা।

—বেশ। এই বলে রাজকুমারী পাশ ফিরে শুলেন। ত্রিস্তানের সে রাত বিনিদ্র কাটলো। রুপালিরও।

## ॥ তের ॥

নব দম্পতির দিন যে কত দুঃখে কাটছে কেউ জানে না। সকলে ভাবে, আহা ওদের সুন্দর মানিয়েছে! যেন এক জোড়া স্বর্গের হংস-হংসী। অথচ, প্রত্যেক দিন ওরা এক ঘরে, এক শয্যায় শোয়, শুয়ে দুজনেই কাঠ হয়ে পড়ে থাকে! সখীরা যখন হাসাহাসি করে ওঁর রাত্রের গল্প বলার জন্য—তখন রুপালি বুকের চাপা কান্না গোপন করেন, বইতে পড়া সমস্ত গল্প ওদের বানিয়ে বলেন। সকলে ভাবে, ত্রিস্তানের মতো স্বামী পেয়েছে, রাজকুমারীর জীবন ধন্য।

একদিন রাজপুরীর সকলে শিকারে বেরিয়েছে। রুপালিও এসেছেন! ঘোড়ায় চড়ে চলেছে সকলে। বনের মধ্যে এক জায়গায় বৃষ্টির জল জমেছে। রুপালির ঘোড়া সেই জলের ওপর দিয়ে যেতে হঠাৎ জল ছিটকে এসে ওর পোশাক ভিজিয়ে দিল। খল খল করে হেসে উঠলেন রুপালি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এনে আবার সেই জলের ওপর দিয়ে গেলেন—এবার জল ছিটকে এসে পোশাকের নীচে ওঁর উরু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিল। হা-হা করে অনেকক্ষণ হাসতে লাগলেন রাজকুমারী। কি রকম অস্বাভাবিক সে হাসি। বারবার রাজকুমারী ফিরে আসতে লাগলেন সেই জলের ওপর। ঘোড়ার পায়ের ধাক্কায় জল ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিতে লাগলো রুপালির অর্ধেক শরীর। রাজকুমারী হাসতে লাগলেন উন্মাদের মতো। সকলেই অবাক। তখন যুবরাজ কাহারডিন নিজের ঘোড়া রুপালির পাশে এনে জিগ্যেস করলো, ও কি বোন, তুই এত হাসছিস কেন?

—কি মজার, কি মজার জিনিস দাদা!

—এতে কিসের মজা?

—আমি জলের সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। মহাবীর ত্রিস্তানও আজ পর্যন্ত যেখানে হাত ছোঁয়াতে সাহস পায়নি, এই সামান্য জলের কি সাহস, সেই আমার উরু পর্যন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে! মজার না দাদা! হা-হা-হা—হাসতে হাসতে রাজকুমারী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন

কাহারডিন তখন অবাক হয়ে ওকে জিগ্যেস করলেন, তোর কিসের দুঃখ বল?

রাজকুমারী চোখের জল মুছে বললেন, না, কিছু না। ও এমনি।

তখন কাহারডিন খুব জোরাজুরি করার পর রাজকুমারী খুলে বললেন সব কথা। এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল—তাঁর অমন রূপবান, গুণবান স্বামী তাঁকে একদিনের জন্য ছুঁয়েও দেখেননি।

এই কথা শুনে উৎকট গম্ভীর মুখে কাহারডিন এলো ত্রিস্তানের পাশে। তাকে আড়ালে ডেকে বললো, ত্রিস্তান, তুমি আমাদের পরিবারের সকলকে অপমান করছো। তুমি রূপালিকে ঘৃণা করেও তাকে বিয়ে করেছো। এখন তাকে করছো চূড়ান্ত অবহেলা। এ অপমান আমি সহ্য করবো না। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। তাতে আমি মরবো জানি—তবু আমি এ অপমান সইবো না।

ত্রিস্তান ক্লিষ্টভাবে বললো, জানতুম এ রকমই হবে। আমার দোষ। কিন্তু যুবরাজ তুমি যদি আমার এ দুর্ভাগ্য জীবনের কথা শোনো হয়তো তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

ঘোড়া থেকে নেমে ওরা বসলো একটা গাছের নীচে। ত্রিস্তান একে একে বলে গেল তার সমস্ত জীবনের কথা। তার বাল্যকাল, অভিশপ্ত যৌবন, তার সর্বনাশা ভালোবাসা, বনবাস তার উদাসীন ভ্রাম্যমান জীবন। তারপর বললো, রাজকুমার, সোনালী হয়তো আমাকে ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ওকে ভুলতে পারি না যে। আমার নিদ্রায়-জাগরণে প্রতি মুহূর্তে সোনালী। মুহূর্তের ভুলে আমি তোমার নিষ্পাপ বোনকে বিয়ে করে, সারা জীবন পাপের ভাগী হয়েছি। মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তি নেই।

অবাক বিস্ময়ে কাহারডিন এ কাহিনী শুনলেন। যেন এক রূপকথা! সেই রূপকথার নায়ক তার সামনে বসে আছে। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাহারডিন বললেন, ত্রিস্তান, একটি মাত্র উপায় আছে। চলো, তুমি আর আমি দুজনে লুকিয়ে কর্নওয়ালে যাই। গিয়ে দেখি, সত্যি রানী সোনালী তোমাকে ভুলে গেছে কিনা। যদি সত্যিই তিনি তোমাকে ভুলে গিয়ে সুখে থাকেন—তাহলে ফিরে এসে আমার বোনকে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকা তোমার উচিত নয়।

ত্রিস্তান চুপ করে রইলো। কাহারডিন আবার বললো, ত্রিস্তান আমি সারা জীবন তোমার বন্ধু হতে চাই।

ত্রিস্তান বললো, সারাটা জীবন তো আমার একজন বন্ধু খুঁজতে খুঁজতেই কেটে গেল। আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন গুরু গর্ভেনাল। তারপর এই তোমাকে পেলাম। চলো, আমরা কর্নওয়ালে যাই।

তীর্থযাত্রার নাম করে ত্রিস্তান আর কাহারডিন একটা জাহাজ সাজিয়ে বেরিয়ে পড়লো। অনুকূল হাওয়ায় জাহাজ এসে পৌঁছুলো কর্নওয়ালের সীমান্তে। ত্রিস্তান বললো, এ রাজ্যে নামা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। চলো লিডানের জমিদার দিনাসের কাছে যাই। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন।

একদিন ভোর রাত্রে ওরা এসে উপস্থিত হলো দিনাসের প্রাসাদে। দিনাস একটু গভীরভাবে ওদের প্রাসাদে অভ্যর্থনা করলেন। যথোচিত আহার ও পোশাক দিলেন। তারপর তিনি থমথমে মুখে বললেন, ত্রিস্তান, তুমি আবার কেন এদেশে এসেছো? তোমার ও সোনালীর মধ্যে যে সত্যিকারের তীব্র ভালোবাসা ছিল তাকে আমি সম্মান করতুম। কিন্তু তুমি সে ভালোবাসার তো সম্মান রাখোনি। আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি বিয়ে করেছো। তোমার সম্বন্ধে আর আমার শ্রদ্ধা নেই।

ত্রিস্তান দিনাসের পা জড়িয়ে ধরে বললো, আপনার তুলনা নেই! আমি বিয়ে করেছি ঠিকই, কিন্তু সে আমার মুহূর্তের ভুল। দিনাস, আমি একটা দিনের জন্যও আমার স্ত্রীকে

স্পর্শ করিনি, সোনালী ছাড়া এক মুহূর্তও আমি অন্য কাউকে মনে স্থান দিইনি। এই কাহারডিন আমার স্ত্রীর ভাই, ও সাক্ষী আছে। ওকে জিগ্যেস করে দেখুন। দিনাস, আপনি বলুন, সোনালী কেমন আছে? সে কি আমাকে ভুলে গেছে? আমি শুনেছি সে আমাকে ভুলে সুখে আছে!

দিনাস বললেন, ত্রিস্তান বাইরে থেকে কতটুকু দেখা যায়! আমি জানি, সে প্রত্যেক দিন তোমার জন্য গোপনে কাঁদে। আমি চোখ দেখলে চিনতে পারি। কিন্তু বাইরে তাকে সুখের ভান করতে হয়। সে তো তোমারই জন্য। নইলে তোমাকে লোকে আবার বদনাম দেবে। তার দুঃখ অনেক বেশী। কিন্তু ত্রিস্তান, তুমি আবার কেন এসেছো? তোমাদের মিলন তো অসম্ভব। তুমি নিজেই তো তাকে তুলে দিয়ে গেছ রাজার হাতে। তোমার দাবী শেষ হয়ে গেছে। আবার তবে কেন এসেছো রাজার শান্তি বিঘ্ন করতে!

চোখের জলে দিনাসের পা ভিজিয়ে ত্রিস্তান বললো, একবার, শুধু একবার আমি ওর সঙ্গে দেখা করে যাবো! শুধু একবার দুটো মুখের কথা শুনে যাবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। আমি একটিবার দেখা করেই চলে যাবো! ত্রিস্তান সেই সবুজ পাথরের আংটিটা দিনাসের হাতে পরিয়ে দিল। দিনাস চলে গেলেন সেইদিনই বিকেলবেলা টিন্টাজেল দুর্গে। রাজা আর রানী তখন পাশা খেলছিলেন। দিনাসকে দেখে রাজা বললেন, বসো দিনাস। খেলাটা শেষ হয়ে যাক্। তারপর আবার পাশার চাল দিতে লাগলেন। দিনাস রানীর সঙ্গে আলাদা কথা বলার কোনো সুযোগই পেলেন না। শুধু রানীকে একবার খেলার চাল দেখিয়ে দেবার জন্য হাতটা বাড়ালেন। হাতে সেই আংটি। আংটি দেখেই দারুণ চমকে উঠলেন সোনালী। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন দিনাসের দিকে। দিনাস চোখেই সম্মতি জানালেন যে, ত্রিস্তান এসেছে। তারপর রাজা মুহূর্তের জন্যে একবার উঠে বাথরুমে যেতেই দিনাস জিজ্ঞেস করলেন, রানী তুমি দেখা করবে ত্রিস্তানের সঙ্গে?

সোনালী বললেন, দিনাস, ত্রিস্তানের ডাক এলে আমি রাজপুরীর এক হাজার দেওয়াল ভেঙেও বেরিয়ে যাবো কেউ আটকাতে পারবে না।

রাজা আবার ফিরে এলেন, তারপর দিনাসকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন সভা গৃহে। রানী কিভাবে দেখা করবেন, কখন—কিছুই শোনা গেল না

দিনাস ফিরে এসে ত্রিস্তানকে সব বললেন আর একটা খবরও দিলেন, দুদিন পর রাজা আর রানী টিন্টাজেল দুর্গ ছেড়ে পাহাড়ের মাথায় গ্রীষ্মাবাসে যাবেন সে কথা শুনে, সেদিনই ত্রিস্তান গ্রীষ্মাবাসে যাবার পথের ধারে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলো সঙ্গে কাহারডিন দুজনেই সশস্ত্র।

বিরাট শোভাযাত্রা বেরুলো রাজা ও রানীর সঙ্গে প্রথমে বাদকবৃন্দ তারপর প্রহরীর দল তারপর পাত্রমিত্রদের সঙ্গে রাজার বিশাল রথ। পরে ছোট ছোট রথে রাজপুরীর মেয়েরা। একটি সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাহারডিন বললো, ঐ তো রানী?

ত্রিস্তান হেসে বললো, ও তো রানীর দাসী!

—তবে, ঐ যে সাদা পোশাক পরা পরীর মতো, ঐ নিশ্চয়ই রানী? সত্যি কি রূপ!

—না, না, ও তো রানীর সখী বিরজা!

তারপর একটি স্বর্ণমণ্ডিত রথে এলেন সোনালী। কি রূপের দ্যুতি তাঁর। এতদিনে একটুও ম্লান হয়নি হুজুর, চাঁদের কি বয়েস বাড়ে? না, চাঁদ কোনো বছর কম সুন্দর হয়ে যায়! রানী সোনালীর রূপ পূর্ণচন্দ্রের মতো অমলিন জ্যোৎস্নাময়

রানীর রথ যখন ঝোপের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন মিষ্টি পাখির ডাক ভেসে উঠলো যেন পর পর সুর মিলিয়ে দোয়েল, বুলবুলি চাতক পাখি ডেকে উঠেছে মিষ্টি অথচ কি করুণ

সেই সুর। রানী সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন, এ ডাক ত্রিস্তানের। এ ডাক বিরহের ডাক। পৃথিবীর একটি মাত্র পাখির পক্ষেই এমন ডাক সম্ভব।

রানী রথ একটু থামাতে বললেন। তারপর উচ্চস্বরে বললেন, বনের পাখি, তোমার গান শুনে আমার মন ভরে যাচ্ছে। আমি পাহাড় চূড়ায় গ্রীষ্মাবাসে যাচ্ছি। তুমি সেখানে এসে আমায় গান শোনাবে? বনের পাখি তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। এই দারুণ গ্রীষ্মে তোমার গান আমায় শান্তি দেবে। তুমি এসো ঠিক।

রথ আবার চলতে লাগলো। শোভাযাত্রা শেষ হয়ে গেলে ওরা দুজনে আবার ফিরে এলো দিনাসের প্রাসাদে।

ত্রিস্তান গোপনে গ্রীষ্মাবাসে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলো।

এদিকে ঘটল আরেক ঘটনা। রাজা মার্ক প্রায় বৃদ্ধ হয়েছেন বলেই সুযোগ পেলে কয়েকজন নাইট রানীর পাশাপাশি এসে ঘুরঘুর করে যদি রানীর কিছু কৃপা পাওয়া যায়! রানী কারুকে গ্রাহ্য করে না। সেদিন গ্রীষ্মাবাসে পৌছবার পর, একজন নাইট একটু আড়াল পেয়ে রানীর কাছে এসে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললো, সত্যি, আমাদের এমন সুন্দরী রানীর জন্যই রাজ্যের এত শ্রীবৃদ্ধি! রাজা মিথ্যাই রানীকে সন্দেহ করেছিলেন। এই তো, রানী কেমন সুখে আছেন এখানে! আর ত্রিস্তানও অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখে আছে বিদেশে।

—মিথ্যে কথা! ত্রিস্তান বিয়ে করেনি! রানী বলে উঠলেন।

—বাঃ রানী আপনি জানেন না? সকলেই তো জানে। ত্রিস্তান ব্রিটানির রাজকুমারী রূপালীকে বিয়ে করেছে।

রানী তখনি উঠে নিজের ঘরে চলে এলেন। শরীরের পোশাকের ভারও যেন অসহ্য লাগলো এমন জ্বালা। ছট্‌ফট্ করে কয়েক প্রস্থ পোশাক খুলে ফেললেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন একবার। তারপর হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁদে ফেললেন। অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। তারপর ভাবলেন আমি কেন কাঁদছি! আমি তো চেয়েই ছিলাম ত্রিস্তান সুখী হোক! কিন্তু তাহলে সে আবার আমার কাছে এসেছে কেন? আমাকে নিয়ে খেলা করতে চায়? না, না, ত্রিস্তানের বিয়ে হয়নি! মিথ্যে কথা! হে ঈশ্বর, এ খবর সোনার আগেই আমার মৃত্যু হলো না কেন? এত দীর্ঘ জীবন আমার কি প্রয়োজন। মুখে যাই বলি, ত্রিস্তানের বিয়ে করা যে আমি সহ্য করতে পারবো না, ঈশ্বর তুমি তা জানো কিন্তু আমিও তো স্বামীর ঘর করছি। সে দোষ কি আমার? ত্রিস্তানেরই ও আমাকে নিজে বিয়ে করতে পারতো—তার বদলে প্রভুভক্তির জন্যে সেই প্রথম বারই কেন রাজার হাতে তুলে দিল? কেন? ত্রিস্তান এমন বিশ্বাসঘাতক! ওঃ ভগবান! রানী তখুনি ডাকলেন সখী বিরজাকে। বললেন, সখী তুই আমাকে বিষ দে! আমি আর পারি না, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে!

বিরজা সব শুনে ঈষৎ হাস্যে বললো, রানী, একি ছলনা তোমার? তুমিও তো স্বামী পেয়েছো, রাজরানী হয়েছো, আর সেই হতভাগ্য একটি স্ত্রী পেতে পারে না?

দৃপ্ত ভঙ্গিতে সোনালী বললো, আমাকে স্বার্থপর বলিস আর যাই বলিস, আমি পারবো না, পারবো না, ত্রিস্তানের পাশে অন্য কোনো মেয়েকে আমি সহ্য করতে পারবো না। তুই আমাকে বিষ দে।

বিরজা তখন বললেন, আচ্ছা, আগে দেখা যাক্ খবরটা সত্যি কিনা। ত্রিস্তান তো দিনাসের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। ওখানে পেরিনিসকে পাঠানো যাক্ না। বিরজা ডাকলো বিশ্বাসী অনুচর পেরিনিসকে।

রানী জ্বলন্ত চোখে তাকে বললেন, পেরিনিস, তুই গিয়ে নিজে শুনে আয় ত্রিস্তানের বিয়ের খবর সত্যি কিনা। যদি সত্যি হয় বলিস্ সে যেন এ রাজ্যের সীমানাতে আর না আসে। কোনোদিন আর আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা না করে! যদি করে, আমি নিজে ওকে প্রহরী দিয়ে ধরিয়ে দেবো। নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর মৃত্যু দেখবো!

পেরিনিসকে দেখেই ত্রিস্তান বুকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, বন্ধু বলো বলো রানী কি খবর পাঠিয়েছে, কোথায় সে আমার সঙ্গে দেখা করবে?

পেরিনিস বললো, ত্রিস্তান একথা কি সত্যি যে, আপনি বিয়ে করেছেন? যদি সত্যি হয়, তবে রানী আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না।

—এ কি কথা বলছো, পেরিনিস? রানী কি জানে না যে—তাকে ছাড়া আর কোনো নারীকে কোনোদিনই আমার পক্ষে ভালোবাসা অসম্ভব? আমরা দুজনে যে একসঙ্গে সেই তীব্র সুরা পান করেছিলাম! হ্যাঁ, একথা সত্যি, আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সে মুহূর্তের ভুলে! আমি আজও সোনালীর প্রতি অবিশ্বাসী হইনি। আমি আজও তাকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করিনি পেরিনিস, তুমি আবার যাও, গিয়ে রানীকে জিজ্ঞেস করে এসো, কখন আমি রানীর সঙ্গে দেখা করতে পারবো। একবার ও আমাকে দেখলেই সব বুঝবে! খবর নিয়ে তুমি আবার ফিরে এসো পেরিনিস। আমি তোমার জন্য প্রতিক্ষায় থাকবো।

কিন্তু পেরিনিস আর ফিরে এলো না। রানী যে মুহূর্তে শুনলেন ত্রিস্তানের বিয়ের খবর সত্যি, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, তোমরা সব যাও। আমি কারুর মুখ দেখতে চাই না! আমি আর কোনোদিন আয়নাতে নিজের মুখ দেখবো না!

ত্রিস্তান বৃথাই কদিন গোপনে ঘুরলো রানীর গ্রীষ্মাবাসের চারিদিকে! রানীর সঙ্গে দেখা হবার কোনো উপায় নেই। তখন ত্রিস্তান বেপরোয়া হয়ে গেল। সে ঠিক করলো দেখা করবেই। শুনতে পেল পরের দিন রানী যাবেন মা মেরীর মন্দিরে প্রার্থনা জানাতে। ত্রিস্তান ভিখারী সেজে মন্দিরের পথে দাঁড়িয়ে রইলো।

পথের লোক সত্যিকারের ভিখারী ভেবে ত্রিস্তানের হাতে ভিক্ষে দিয়ে যাচ্ছে। ত্রিস্তান নুয়ে নুয়ে সবার কাছ থেকেই ভিক্ষে নিচ্ছে। তারপর এলো রানীর রথ—সঙ্গে বহু দাস দাসী ও এক ডজন প্রহরী। ভিখারী ছুটে এসে রথের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, রানী, আমাকে একবার দয়া করো!

সোনালী সেই ভিখারীর কুৎসিত ছদ্মবেশ সত্ত্বেও, উন্নত দেহ ও মুখের রেখা দেখেই ত্রিস্তানকে চিনতে পারলেন! চিনতে পারলেন ত্রিস্তানের কণ্ঠস্বর। কিন্তু ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভিখারী রথের আরও সামনে এসে বললো, রানী একবার, শুধু একবার দয়া করো।

রানী মুখ কুঞ্চিত করে বললেন, চালাও রথ

ভিখারী তখন রথের চাকা ধরে বললো, রানী একবার আমার অবস্থা দেখো! আমি সত্যিই ভিখারী হয়েছি। আমাকে তুমি সামান্য দয়া করলে, তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না—কিন্তু আমার সারা জীবনটা ভরে যাবে! রানী, মাত্র একবার, জীবনের শেষবার—

সোনালী প্রহরীদের বললেন, সরিয়ে দাও লোকটাকে! সঙ্গে সঙ্গে পনেরো কুড়িটা সবল হাত ভিখারীকে চেপে ধরলো। তারপর হিঁচড়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যেতে লাগলো ওকে ভিখারী সেখান থেকেই করুণ, আর্ত গলায় চেচাতে লাগলো, রানী, দয়া করো, দয়া করো, একবার—

রানী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, দয়া চাইবার স্পর্ধা কতখানি। আবার হাসতে লাগলেন হা-হা করে। রানীর সেই হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত। সেই হাসির শব্দে মন্দিরের ঘন্টাগুলোও যেন দুলে ঢুং ঢুং করে বাজতে লাগলো। হাসির শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে গেল ডানা ঝটপটিয়ে এক ঝাঁক পায়রা। আশেপাশের লোকেরা সেই হাসি শুনে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে ভুলে গেল। ভিখারী মুখ তুলে কিছুক্ষণ দেখলো সেই হাসি, রানীর গর্বোদ্ধত মুখ—তারপর সে ধীর পদক্ষেপে পিছন ফিরে চলে গেল।

সেই রকম হাসতে হাসতেই রানী মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। কয়েক ধাপ ওঠার পরেই শরীর দুলে উঠলো তাঁর। শূন্যে কিছু যেন একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে রানী সোনালী ঝুপ করে সেই মন্দিরের সিঁড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

## ।। চোদ্দ ।।

পিছন ফিরে সেই যে হাঁটতে লাগলো ত্রিস্তান, বহুক্ষণের মধ্যে আর থামলো না। কোথায় চলেছে, কোন্ দিকে চলেছে, কোনোই খেয়াল নেই। সে যেন রয়েছে একটা ঘোরের মধ্যে, একটা নিশি পাওয়া মানুষের মতো শুধু এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। কাহারডিন তার জন্য অপেক্ষা করছিল দিনাসের প্রাসাদে। তার কথা ত্রিস্তানের মনে পড়লো না।

সারা রাত ধরে হাঁটলো ত্রিস্তান। সর্বক্ষণ তার কানে ভাসছে সোনালীর সেই তীব্র উপেক্ষার হা-হা হাসির শব্দ। সেই দৃশ্যের কথা ভেবেই তার শরীর শিউরে উঠতে লাগলো। তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে যেন ঝন্‌ঝন্ করে বেজে চলেছে সোনালীর সেই হাসি।

ত্রিস্তানের অঙ্গে তখনও ভিখারীর ছদ্মবেশ, হাতের মুঠোয় তখনও সেই ভিক্ষালব্ধ পয়সা। পরদিন সকালে সে একটি অচেনা নগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একজন তীর্থযাত্রী স্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে ত্রিস্তানকে থামিয়ে নিজে থেকেই একটা পয়সা ভিক্ষে দিলেন। তখন ত্রিস্তানের সম্বিৎ ফিরে এলো। আত্মস্থ হয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। ভিখারীর পোশাকে নিজেকে বেশ ভালোই লাগলো তার। একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সে বেশ পটু ভঙ্গীতে পথচারীদের কাছ থেকে করুণ সুরে ভিক্ষে চাইতে লাগলো। বালকের মতো অল্পক্ষণের মধ্যেই মেতে উঠলো এই খেলায়। কোনো রূপসী নাগরিকা হয়তো তাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাচ্ছে ভিক্ষে না দিয়ে, ত্রিস্তান ঠিক তার পিছনে পিছনে বহুদূর ছুটে কাতর সুরে কেঁদে কেঁদে আদায় করে নিচ্ছে ভিক্ষে।

ছিল সে রাজার কুমার, স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে নিজের রাজ্য। সে বিখ্যাত বীর, কালো বর্ম পরে সাদা ঘোড়ায় চেপে যাবার কথা তার, থাকার কথা রাজপ্রাসাদে। অতবড় বীর সে ইচ্ছে করলে যে-কোনো রাজ্যে গিয়ে এখনও সেনাপতির পদ পেতে পারে। সে রূপালির স্বামী, সে রাজ্যে কত সম্মান—কিন্তু ত্রিস্তানের কিছুই ভালো লাগে না। সে অনেক যুদ্ধ করেছে, কিন্তু এখন এই দীন ভিখারী সেজে থাকতেই তার ভালো লাগছে। দেখতে দেখতে তার অঞ্জলি ভরে গেল ভিক্ষের পয়সায়।

তারপর ত্রিস্তান একা একা ঘুরতে লাগলো সেই অচেনা শহরে। এখানে সে আগে কখনও আসেনি। বেশ পরিষ্কার এই শহরের রাস্তা, নাগরিকরা বেশ ধনবান মনে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা বড় উদ্যানের কাছে এসে পৌঁছলো। সেখানে বিরাট উৎসব হচ্ছে। বড়দিনের মেলা। বন্‌বন্ করে ঘুরছে নাগরদোলা, সেখান থেকে ভেসে আসছে কচি শিশুদের কণ্ঠে আনন্দলহরী। এক জায়গায় তীরন্দাজরা লক্ষ্য ভেদের পরীক্ষা দিচ্ছে, একটা সদ্য মারা হরিণ দূরে ঝোলানো—কে তার চক্ষু বিদ্ধ করতে পারে। শন্ শন্ করে ছুটে যাচ্ছে

তীরন্দাজদের তীর। আর এদিকে একটা বিশাল হাতীর ওপর একদল মেয়ে পুরুষ হল্লা করছে। ভাল্লুকের পোশাক পরে দুটো লোক দেখাচ্ছে কুস্তীর খেলা। আশেপাশে কয়েকটা সরাবের দোকান, তার একটার সামনে ফুলের মতো ঘাগ্‌রা উড়িয়ে ক্ল্যারিওনেটের তালে তালে নাচছে একটি বেদেনী। ত্রিস্তান ঘুরে দেখছে।

এক জায়গায় দেখতে পেল গোল করা বড় ভিড়। একজন বাজীকর সেখানে পুতুলনাচের খেলা দেখাচ্ছে। বাজীকরের পোশাক অদ্ভুত, একটা সবুজ রঙের আলখাল্লা পরেছে, মাথায় পালকের টুপি। হাতে একটা ডমরু নিয়ে ডিং-ডিং করে বাজিয়ে সে চেঁচাচ্ছে, এবার আরম্ভ হবে বড় খেলা, প্রেমের খেলা, আরম্ভ হলো, আরম্ভ হলো প্রেমের খেলা!

তারপর সে খেলা আরম্ভ করলো। তার সামনে নানারকম পুতুল—খেলা শুরু করার সময় সে হেঁকে উঠলো, এ খেলার নাম 'ত্রিস্তান আর সোনালীর খেলা'—একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। কিন্তু সত্যি ঘটনা! দেখে যান বাবু মশায়রা।

খেলার নাম শুনে বিষম চমকে উঠলো ত্রিস্তান। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা ভিখারী একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে দেখে এক সুন্দরী রমণী নাক কুঁচকোলেন।

বাজীকর একটি পুতুলের সুতোয় টান দিয়ে বললেন, এর নাম ত্রিস্তান—এর মতো সুন্দর, এর মতো বীরপুরুষ আর দুনিয়ায় দুটি নেই। ছেলেবেলায় ওর বাপ-মা মারা যায়...এই দেখনু বাবু-বিবিরা, ত্রিস্তান এখন রাজা মার্ককে প্রণাম করছে।—এই বার ত্রিস্তান যাচ্ছে মোরহল্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। লড়ে যা ব্যাটা, লড়ে যা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, বহুৎ আচ্ছা, এই দেখুন ত্রিস্তান যুদ্ধে জিতে গেল। সে ছাড়া আর কে জিতবে! এবার সে আয়ার্ল্যাণ্ডে যাবে ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই করতে। সেটা খুব ভারী লড়াই। হ্যাঁ, এইবার.

এক এক করে বাজীকর দেখিয়ে গেল ত্রিস্তানের জীবনের সব ঘটনা। ড্রাগন হত্যা, সোনালীর সঙ্গে দেখা, রাজা মার্কের হয়ে ত্রিস্তানের সঙ্গে সোনালীর হাতে হাত দিয়ে বিয়ে, ফিরে এসে রানী সোনালীর কাছে তার গোপন অভিসার, ধরা পড়ার সব ঘটনা, বনে পালিয়ে যাওয়া...

দর্শকরা দেখছে আর ঘন ঘন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। ভিখারীবেশী ত্রিস্তান দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। প্রথমটায় বেশ মজা পেয়ে তার হাসি আসছিল, কিন্তু পরের দিকে নিজের জীবনের সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখে—তার বুকের মধ্যে বহু দীর্ঘশ্বাস জমাট হয়ে গেল।

রাজা মার্কের হাতে রানী সোনালীকে ফিরিয়ে দিয়ে ত্রিস্তান বঞ্চিত হতভাগ্যের মতো চলে গেল নিরুদ্দেশে—এই পর্যন্ত দেখিয়ে খেলা শেষ করলো বাজীকর। দর্শকরা ত্রিস্তানের দুঃখে সরবে সমবেদনা জানাতে লাগলো। টপাটপ পয়সা পড়লো বাজীকরের সামনে।

ক্রমে দর্শকের ভিড় সরে গেল, বাজীকর যখন পয়সা কুড়োচ্ছে, ত্রিস্তান এগিয়ে এলো তার সামনে। তার হাতের সমস্ত ভিক্ষের পয়সা সে ঢেলে দিল বাজীকরের হাতে। হতচকিত বাজীকর মুখ তুলে তাকাতে, ত্রিস্তান তাকে মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলে। বাজীকর, তুমি এর পরের ঘটনা জানো?

বাজীকর বললো, এর পর আর কি আছে? রাণীকে ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেল ত্রিস্তান, তারপর সে বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, কিংবা মনের দুঃখে মরেই গেছে হয়তো! কেউ আর তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তুমি জানো নাকি?

–একটু একটু জানি। আমি তো নানা দেশে ঘুরে বেড়াই কিছু কিছু শুনেছি।

–কি শুনলে? কোথায় আছে সে?

–বলবো পরে। কিন্তু তুমি বল তো, এ গল্প কি এখানেই শেষ হলে মানায়? আর একটু থাকা উচিত নয়?

তা বলা বড় মুশকিল! জীবনে কোন ঘটনা ঘটে গেলে, তারপরই বলা যায় সেটা গল্পে মানায় কি মানায় না। কিংবা, জীবনের ঘটনাই গল্প হতে পারে কিন্তু বানানো গল্পের মতো জীবন হয় না।

–কিন্তু বাজীকর, তোমার কি মনে হয় না, রানীর সঙ্গে ত্রিস্তানের আরেকবার দেখা হওয়া উচিত? শেষবার?

সবুজ আলখাল্লা আর পালকের টুটি পরা দীর্ঘদেহ বাজীকর। মুখে এক মুখ দাড়িতে তার চেহরাটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু বড় মমতাভরা গলায় সে বললো, তাহা আমি চাই ঐ হতভাগ্যের রানীর সঙ্গে আবার দেখা হোক কিন্তু তা কি আর সম্ভব? ত্রিস্তানের কথা বলতে গিয়ে আমার কান্না পায়। বড় দুঃখী ও লোকটা।

ত্রিস্তান মাটির দিকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সে বললো, বাজীকর, আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দেবে? আমি তোমার খেলায় সাহায্য করবো।

বাজীকরের সঙ্গেই থেকে গেল ত্রিস্তান। ওর সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায়। বাজীকর যখন নানান খেলার সঙ্গে 'ত্রিস্তান আর সোনারী'র খেলা দেখায়–তখন ও নিজেই পুতুলগুলো এগিয়ে দিয়ে বাজীকরকে সাহায্য করে। বনের মধ্যে যেখানে ত্রিস্তান আর সোনালী কুড়েঘর বেঁধে আছে– সেই দৃশ্যটায় ত্রিস্তান পাখির ডাকের অনুকরণে শিষ দিয়ে উঠে। যে গল্প দেখে দর্শকরা চোখের জল ফেলে, সেই গল্পের নায়ক যে ভৃত্যবেশে এখানেই বসে আছে, তা কেউ ঘূর্ণাক্ষরেও সন্দেহ করে না।

ত্রিস্তানের মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। বাজীকর লোকটা অদ্ভুত ধরনের। রাত্রিবেলা এক তাঁবুতে দুজনে শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প করে। বাজীকর তাকে শোনায় বহু অজানা দেশের কথা, সে বলে হিন্দুস্তান নামে নাকি একটা আজব দেশ আছে– যেখানে মানুষ ইচ্ছেমতো রূপ বদলাতে পারে–একটা লোকই দিনের বেলায় মানুষ আর রাত্রিবেলায় বাঘ হয়ে যায়। সেখানে গাছও কথা বলে। সাধুরা মাটি থেকে এক হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে বসে তপস্যা করে। সেখানকার রাজারা প্রত্যেকেই তিনশো–চারশো রানীকে বিয়ে করে– প্রত্যেক রাতেই রাজার সঙ্গে থাকে একজন নতুন রানী।

বাজীকর নিজেও অনেক মন্ত্র–তন্ত্র জড়ি বুটি জানতো। মানুষের চোখের সামনে আঙুল নেড়ে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, তাকে দিয়ে হুকুম মতো যা ইচ্ছে করানোতে সে ছিল ওস্তাদ। তার কাছে এরকম ওষুধ ছিল –যে ওষুধ গায় মাখলে মানুষের গায়ের চামড়ার রং এক মাসের জন্য বদলে যায়। ত্রিস্তান সেই ওষুধ খানিকটা চেয়ে নিয়েছিল ওর কাছ থেকে।

বাজীকরের একমাত্র দোষ ছিল, মাঝে মাঝে মদ খেয়ে সে অত্যধিক মাতাল হয়ে পড়তো। সে সময়টা সে হয়ে যেতে অন্য মানুষ। তখন যত রকম কুৎসিত পালাগাল, জিনিসপত্র ভাঙা, যে–কোনো লোককে ধরে মারা ছিল তার স্বভাব। বাজীকরের এই অবস্থাটা এক–এক সময় ত্রিস্তানের অসহ্য লাগতো।

বেশ শান্ত হয়েছিল ত্রিস্তান। হঠাৎ একদিন যেন বন্যার মতো সোনালীর কথা তার মনে ফিরে এলো। তার শরীরের রক্ত যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল সোনালীর জন্য। কানে ভেসে উঠলো, সোনালীর সেই উপহাসের হা–হা হাসি। এক রাত্রে তাঁবুর মধ্যে একা শুয়ে থাকতে থাকতে ত্রিস্তানের আবার মনে পড়লো–মন্দিরে যাবার পথে সে সোনালীর রথের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, খুব কাছে থেকে দেখেছিল তাকে–অথচ একবার বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেনি। তার বুকটা এক মুহূর্তে শূন্য হয়ে গেল। তার হাত আর বুক এর মাঝখানে

একটা বিশাল শূন্যতা—এখানে সোনালীর নরম শরীর থাকার কথা ছিল। ত্রিস্তান ভাবে—তার বেঁচে থেকে আর কি লাভ। সোনালীর ঘৃণা দেখবার জন্যও তাকে বেঁচে থাকতে হলো!

কিন্তু তবু ত্রিস্তান জানে, সোনালীকে ছাড়া তার মরারও উপায় নেই। সে জানে, সোনালী তাকে যতই অবহেলা, অপমান করুক, তবু সোনালীর কাছে তাকে বার বার ফিরে যেতে হবে।

একদিন ত্রিস্তান বাজীকরকে কিছু না বলে আবার বেরিয়ে পড়লো এক বজ্রে। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি পর সে এসে পৌছলো টিন্টাজেলে। ত্রিস্তান বাজীকরের সেই ওষুধ মেখে নিল সারা গায়ে মুখে। তামাটে রঙের শরীর হয়ে গেল ত্রিস্তানের। ত্রিস্তান মাথার চুল সব কামিয়ে ফেললো, সারা গায়ে এঁকে নিল অদ্ভুত সব উল্কি। তারপর বন্দরের ঘাটে সে যখন খালি পায়ে একা বসে রইলো—তাকে দেখে মনে হয় রাস্তার পাগল। ন্যাড়া মাথা, বিকৃত রং শরীরের, বীভৎস চেহারা ত্রিস্তানের।

নগর থেকে লোক আনাগোনা করছে বন্দরে। কেউ কেউ আসছে রাজসভা থেকে। অনেকেরই মুখে রাজার গুণগান! কেউ কেউ আবার বলছে, কিন্তু ভাই, রানীর মুখ বড় বিষন্ন। কিছুদিন থেকেই দেখছি, রানী কারুর সঙ্গে কথা বলছেন না, একটুও হাসছেন না। কি ব্যাপার রে ভাই, রানীর কি অসুখ হয়েছে নাকি?

রনী। রানীর কথা শুনেই ত্রিস্তান উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তখুনি তার ইচ্ছে হলো রাণীর সঙ্গে দেখা করতে—সেই দিনের বেলাতেই। তাতে যদি সে ধরা পরে, তার মৃত্যু হয় হউক! তবু রানী জানবে...ত্রিস্তান তার সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রাণ দিয়েছিল।

ত্রিস্তান একটা ওক গাছের ডাল ভেঙে নিল। তারপর সেটা মাথার ওপর দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বিকৃত গলায় হা-রে-রে-রে করে পাগলের মতো ছুটতে লাগলো রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ছেলেরা তাকে দেখে মজা পেয়ে এই পাগলা, বলে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। বয়স্করা কৌতুকে দেখতে লাগলো সেই বদ্ধ উন্মাদকে।

উন্মাদ এসে দাঁড়ালো রাজপুরীর সিংহদ্বারে। সান্ত্রীরা ওকে দেখে প্রথমে ওর ন্যাড়া মাথায় কয়েকটি চাঁটি মেরে হাতের সুখ করে নিল। তারপর বললো—কি-রে পাগলা, এখানে কি চাস?

পাগল গম্ভীর হয়ে বললো, খবরদার আমার গায়ে হাত তুলো না বলছি। আমি রাজার আত্মীয়! আমি স্বর্গে দেবতাদের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। এখন রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি।

—ওরে বাবা, নেমন্তন্ন খেতে এসেছিস এই রাজবেশে! তার চেয়ে একেবারে দেবতাদের পোশাকই পরে থাক্ না! এই বলে প্রহরীরা চেষ্টা করলো টানাটানি করে ওর পোশাক খুলে উলঙ্গ করে দেবার। উন্মাদ তখন হাস্যকর ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে মাথার ওপর বন্ বন্ করে লাঠিটা ঘোরাতে লাগলো।

চেঁচামেচি শুনে রাজা খবর নিতে পাঠালেন। তারপর, পাগলের কথা শুনে বললেন ওকে ডাকো, একটু মজা করা যাক্। রানীও অনেকদিন হাসেননি। পাগল ওদের সামনে গিয়ে আভূমি প্রণাম করলো, তারপর কণ্ঠস্বর বিকৃত করে বললো, মহারাজকে দেখেই আমার মনটা কেমন হু হু করে। কতদিন আপনাকে দেখেনি।

রাজা হাসতে হাসতে বললেন, তা কি উদ্দেশ্যে তোমার এখানে আগমন।

—রানী সোনালীর জন্য। মহারাজ, আমার সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে এনেছি। তার নাম, হীরামনি। আঃ কি সুন্দর সে মহারাজ কি বলবো! আপনি তাকে নিয়ে সোনালীকে আমায় দিয়ে দিন না।

রাজা আবার হেসে বললেন, তোমার সাধ তো কম নয়। রানীকে নিয়ে তুমি রাখবে কোথায়? তোমার কুঁড়ে ঘরে?

—কি বলছেন মহারাজ? আকাশে স্বর্গ আর মেঘের মাঝখানে আমর একটা স্ফটিকের ঘর আছে! অসংখ্য গোলাপফুলে তার চারদিক ঘেরাও। সে ঘর কখনও অন্ধকার হয় না। মহারাজ, রানীকে আমি সেখানে রাখবো।

সভার সব লোকেরা অট্টহাসি করে উঠলো। রাজা বললেন, লোকটার কথার জোর আছে বটে! উন্মাদ তখন একেবারে ওঁদের পায়ের কাছে এসে বসে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানী সোনালীর দিকে। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন, পাগল, আমি না হয় রানীকে দিয়ে দিলুম, কিন্তু তোমার অমন রূপ রাণীর পছন্দ হবে কি?

—সে কি মহারাজ? রানীর জন্য আমি সারা জীবন কত অসাধ্য সাধন করেছি? রাণীর জন্যই আজ আমি এরকম পাগল হয়েছি, তা কি রানী জানেন না?

হাসিতে আবার ফেটে পড়লো সবাই। রাজা হাসির দমকে ফুলতে ফুলতে বললেন, তবে তো তুমি যে সে লোক নও! তোমার নাম কি?

উন্মাদ গুম গুম করে নিজের বুকে কিল মেরে বললো, আমার নাম ত্রিস্তান। জীবনে মরণে রানীকেই আমি ভালোবাসি!

অন্য সকলের হাস্যরোলের মধ্যেও রানী সোনালী ওর নাম শুনে কেঁপে উঠলেন। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ ভালো লাগছে না ওকে বিদায় করে দিন!

উন্মাদ তখন রানীর পা ছুঁয়ে বললো, রানী আমাকে চিনতে পারছেন না? সেই যে মোরহল্টের সঙ্গে যুদ্ধে আমি আহত হয়ে মুমূর্ষু হবার পর ভাসতে ভাসতে আপনার দেশে গিয়েছিলাম, আমার হাতে ছিল শুধু বীণ।। তখন আপনি আর আপনার মা আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। আপনার মনে পড়ে না? রানী ঘৃণায় পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, এই সভায় এমন কেউ নেই – যে এই জঘন্য লোকটাকে দূর করে দিতে পারে?

সভাসদরা তখুনি ছুটে এলো। উন্মাদ তখন লাঠি ঘুরিয়ে বললো, খবরদার, খবরদার, আমি বীর ত্রিস্তান। সাবধান! আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে এমন সাহস কার? এই বলেই সে মাটিতে ডিগবাজি খেতে লাগলো। তার অঙ্গভঙ্গি দেখে সভাসদরা ওকে মারার বদলে হেসেই কুটিকুটি। রানী তখন রাজার পোশাক চেপে ধরে বললেন, মহারাজ আপনি ওকে যেতে বলুন।

রাজা তবু হাসতে লাগলেন। পাগল আবার বললো, রানী, আমকে চিনতে পারছেন না? সেই যে আমি ড্রাগনকে মারলুম? ওর জিভটা কেটে লুকিয়ে রেখেছিলুম মোজার মধ্যে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তখন একটা বীর ছিলাম বটে! আপনি তো সেবার আমাকে বাঁচালেন। মনে পড়ে না?

রানী ক্রুদ্ধভাবে বললেন, এই লোকটা ঐ সব বীর পুরুষের নাম উচ্চারণ করে তাদের অপমান করছে। কোথা থেকে ঐ সব শুনে এসে মাতলামি শুরু করছে এখানে? একটা মাতালের মাতলামি দেখে আমার মোটেই আনন্দ হয় না।

উন্মাদ তখন হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললো হ্যাঁ, রানী আমি মাতাল। সেই যে সেই এক গ্রীষ্মের বিকেল–সমুদ্রের বুকে–তুমি আর আমি এক সঙ্গে এক পাত্র থেকে মায়াবী আরক পান করেছিলাম– সেই থেকে আমি মাতাল। সারাজীবনের জন্য মাতাল। তোমার নেশা হয়তো কেটে গেছে– কিন্তু আমার নেশা মৃত্যুর আগে কাটবে না।

পাগল আবার এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো—যে সভার সকলের না হেসে উপায় নেই। রাজাও হাসতে লাগলেন। রানী একাই সভা ছেড়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। রাজা তাঁকে বসালেন হাত ধরে।

রাজা বললেন, আমার সভায় বিদূষক নেই। তোমাকে আমার সভাসদ বানাতে হবে দেখছি। রানীকে ভালোবাসা ছাড়া তোমার আর কি কি গুণ আছে হে?

পাগল সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে সোৎসাহে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ মাহরাজ, আমার মধ্যে আরও অনেক গুণ আছে। আমি ডিগবাজি খেতে পারি, আকাশে লাফ দিতে পারি, বীণা বাজাতে পারি, যুদ্ধ করতেও পারি। দেখবেন মহারাজ, দেখবেন?

রাজা বললেন, থাক্, থাক্, আজ থাক্। পরে দেখবো। তুমি এখানেই থেকে যাও বরং।

সভা ভঙ্গ করে রাজা উঠে গেলেন রানীকে নিয়ে। তারপর একটা পাগল কোথায় থাকে না থাকে কে তার খোঁজ রাখে। সে রাজপুরীর সিঁড়ির নিচে, আস্তাবলে পড়ে রাইলো। প্রহরীরা তাকে খোঁচাখুচি করে আনন্দ পায়।

নিজের ঘরে ফিরে হু-হু করে কাঁদতে বসলো রানী। আয়ত চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হয়ে গেল। হাতের সোনার কাঁকন দিয়ে নিজের কপালে আঘাত করতে করতে বললেন, আমি ক্রীতদাস! রানী নই। আমার চেয়ে দুর্ভাগিনী কেউ নেই এ পৃথিবীতে।

বিরজাকে ডেকে বললেন, বিরজা, তুই আমাকে একটু বিষ যদি দিতে পারিস আমি তোকে যথাসর্বস্ব দিয়ে যাবো। এ আমার কি অসহ্য জীবন! আজ আমি যা শুনলাম— সে কথা শোনার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে হলো। যে-কথা ত্রিস্তান আমি আর তুই এই তিন; জন ছাড়া কেউই জানে না—আমার সেই প্রিয়তম গোপন কথা—একটা যাদুকর কিংবা ভাঁড় এসে সবার সামনে বলছে! জানি না ত্রিস্তান বেঁচে আছে কিনা। আমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। সে অপমানই সহ্য করে গেছে। সে জানে না আমার অনুতাপ। কিন্তু কোথা থেকে এই আপদ এসে জুটলো! ত্রিস্তানের নাম উচ্চারণ করে আমার বুক জ্বালিয়ে দিল! ওঃ আর পারি না—

বিরজা বললো, তুমি একটা সামান্য পাগলকে দেখে এমন বিচলিত হচ্ছো। কেন?

—ওর দিকে তাকালেই আমার ভয় করে। আমাদের গোপন কথা ও কি করে.

—রানী, হয়তো ও—ই ত্রিস্তান।

—অসম্ভব! তুই দেখে আয় কি বিকট চেহারা ওর! ওটা কি মানুষ না জন্তু? তোর কি মাথা খারাপ বিরজা! — সেই ত্রিস্তান, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ, কন্দর্পকান্তি—তার সঙ্গে তুই ওর তুলনা করছিস। তুইও দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।

—হবে, ও হয়তো ত্রিস্তানের অনুচর। তার কাছ থেকে কোনো খবর এনেছে?

—তা হলে তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন এখানে? যা দেখে আয়। ডেকে নিয়ে আয়। যা।

সিঁড়ির নিচে বসে ছিল উন্মাদ। দূর থেকে বিরজাকে দেখেই আকুলভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বিরজা, আমায় চিনতে পারো না!

বিরজা ভয়ে পিছিয়ে এসে বললো, একি? তুই আমার নাম জানলি কি করে! সরে যা, অত কাছে আসিস না।

বিরজা, তুমিও আমাকে ভুলে গেলে! একদিন নিজের লজ্জা বিসর্জন দিয়ে তুমি বাঁচিয়েছিলে আমাকে আর সোনালীকে। আর আজ—

—কে তুই? কি করে জানলি এ কথা?

–বহুদিন থেকে জানি। বিরজা, আমাকে দয়া করো, একবার আমাকে রানীর কাছে নিয়ে যাও। মনে নেই, তোমার সেই লুকনো কলসী থেকে মায়াবী আরক পান করেছিরাম একদিন। সেইদিন তুমি বলেছিলে, ভালোবাসা মানেই মৃত্যু। আমার আর সোনালীর ভালোবাসা আর মৃত্যু একসঙ্গে জড়ানো। বিরজা আমাকে দয়া করো।

বিরাজা ভয়ে কাঁপতে লাগলো একি দারুণ কথা এই উন্মাদের মুখে। একথা তো ত্রিস্তান ছাড়া আর কারুর পক্ষে কিছুতেই জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বীভৎস লোকটা কি করে ত্রিস্তান হয়। যদি ত্রিস্তান হয়ও, তাহলে তো টের পেলে প্রহরীরা যে-কোন মুহূর্তে ওকে খুন করবে।

বিরজা দ্বিধার মধ্যে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগলো। তারপর আর কিছু ঠিক করতে না পেরে-ফিরে এলো রানীর ঘরের দিকে। পাগলও ছুটে এলো তার পিছনে পিছনে। তারপর দরজার কাছে রানীকে দাঁড়ানো দেখে- বুক ফাটা আওয়াজ ' সোনালী' বলে চেঁচিয়ে এগিয়ে গেল দু'হাত বাড়িয়ে।

ভয়ে, ঘৃণায়, কুঁকড়ে সোনালী পিছিয়ে গেলেন দেয়ালের দিকে।

উন্মাদ তখন থমকে দাঁড়ালো। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, সোনালীর ঘৃণাও আমাকে দেখতে হলো শেষ পর্যন্ত। কোনদিন ভাবিনি, সে আমাকে দেখে ভয় পেয়ে সরে যাবে। অথচ সে বলেছিল, আমার ডাকে সে কোনোদিন সাড়া দিতে ভুলবে না! সোনালী, ভালোবাসা এত সহজে মরে যায়? নদীতে যখন জল থাকে-সেই জল দুকূল ছাপিয়ে যায়-তখন তা নদী। আর সব জল শুকিয়ে গিয়ে যখন শুকনো নদীটা পড়ে থাকে-তখনও সেটা নদীর আকৃতি কিন্তু তখন আর সেটা নদী নয়। সেনালী, ভালোবাসাহীন জীবন কি জীবন?

সোনালী এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে বললো, পাগল, তুমি যেই হও কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিতে এসেছো? কেন তুমি আমাকে অপমান করছো? তুমি যখন এত খবর জানো তখন তুমি নিশ্চয়ই ত্রিস্তানের খবর জানো। বলো, সে কেমন আছে?

পাগল ধীরে স্বরে বললো, রানী, ত্রিস্তান জীবনমৃত। সে বেঁচে আছেও বলতে পারো, অথবা মরে গেছে তাও ভাবতে পারো।

–কোথায় ত্রিস্তান? সে কোথায়?

–সোনালী, তুমি তাকে চিনতে পারলে না?

–না, না, না, তুমি ত্রিস্তান নও! তুমি নও! তোমার প্রমাণ কোথায়? কোথায় সেই সবুজ আংটি? অথবা এ বাড়ির কুকুর হডিন, তাকে ডাকি? সে ত্রিস্তান ছাড়া আর কেউ সামনে গেলেই কামড়াতে আসে- সে তোমায় চিনতে পারবে?

উন্মাদ তখন বিষাদে শান্ত হয়ে বললো, না রানী, কোনো প্রমাণ থাক্। হৃদয় যখন হৃদয়কে টানে না তখন আর প্রমাণে কি হবে? তুমি নিজে আমায় চিনতে পারলে না- আর সেই কুকুরের চেনা- তুমি স্বীকার করতে চাও! সোনালী, ভালোবাসা কি শুধু রূপে? আজ আমার বাইরের রূপ দেখে তোমার ঘৃণা? আমি কি শুধু রূপের জন্য তোমায় ভালোবেসেছিলুম? তবে, তোমার বাবা যখন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আমি কেন তখুনি বিয়ে করিনি? আমি তো তখুনি তোমায় নিয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পারতুম! সোনালী ভালোবাসা চামড়ার নিচে থাকে। ওপরে নয়। সেই ভালোবাসার জন্যই আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে স্পর্শ করতে পারিনি।

রানী তখন উন্মাদিনীর মতন নিজের মাথার সোনালী চুল ছিঁড়তে লাগলেন। এক টানে খুলে ফেললেন নিজের পোশাক! তাঁর সাদা পায়রার মতো দুটি বুকগভীর নিঃশ্বাসে দুলতে লাগলো। চোখে জল, কিন্তু বিকৃতভাবে হেসে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, তবে নাও গ্রহণ

করো আমাকে। যদি তুমি ত্রিস্তান হও, আমার এই শরীরটা পিষে দাও তোমার বুকে। যদি তুমি ত্রিস্তান হও, তবে বুঝতে পারবে, তাকে না পেয়ে আমর বুকে কি আগুন জ্বলছে! আমাকে নিয়ে যাও– যেখানে আছে শ্বেতমর্মের দুর্গ, যার এক হাজার ঘরের জানালা দরজায় আলো জ্বলে– যেখানে অন্তহীন পাখির গানে, যেখান থেকে আর কেউ কখনো ফেরে না। আমাকে নিয়ে যাও- ধরো। আমাকে, যদি সত্যিই তুমি ত্রিস্তান হও। কিন্তু সাবধান, যদি তুমি ত্রিস্তন না হও–সাবধান, সাবধান, সে ছাড়া আর কেউ সত্যিকারের আমাকে পায়নি। এসো, তুমি যদি ত্রিস্তান হও, এসো–

উন্মাদ শান্ত স্বরে বললো, যদি নয়, আমার নাম ধরে ডাকো–

রানী সেখানে দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। উন্মাদ নিজের জায়গাতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো! সে নিচু হয়ে রানীকে ধরতে গেল না। তার মুখ অদ্ভুত উদাসীন। একটু পরেই সোনালীর আবার জ্ঞান হলো। লাল, অস্থির চোখ মেলে সেই উন্মাদকে দেখেই বিষম চমকে উঠলেন। সম্পূর্ণ অসংবদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, মায়াবী! জাদুকর! শয়তান! আর একটু হলেই আমাকে ভুলিয়েছিলি। কে কোথায় আছে? বাঁচাও! বাঁচাও! প্রহরী! প্রহরী! এ আমাকে খুন করতে এসেছে– এ ত্রিস্তানকে খুন করেছে– আমাকেও মারবে, বাঁচাও, বাঁচাও!

মুহূর্তে ছুটে এলো প্রহরীরা। সোনালী উন্মাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, একে নিয়ে যাও। মেরে ফেলো, যা ইচ্ছে করো, দূর করে দাও আমার চোখের সামনে থেকে। দূর করে দাও।

প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে ফেললো উন্মাদকে! সে একটুও প্রতিবাদ করলো না। ওরা তখুনি টানতে টানতে ওকে নিয়ে এলো দুর্গের বাইরে। প্রচুর লাথি-ঘুঁষি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল সমুদ্রের পাড়ে।

## ।। পনেরো ।।

ত্রিস্তান আবার ফিরে চলেছে ব্রিটানিতে! ধীর মন্থর তার পদক্ষেপ। যেন সে জানে না কেন সে আবার ফিরে যাচ্ছে কাহারডিনের রাজ্যে, রূপালির রাজ্যে। যেন সে জানে না, কেনই বা সে গিয়েছিল সোনালীর কাছে।

বন পেরুলেই দুর্গা বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় একটি সুদর্শন তরুণ অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা হলো তার। যুবকটির বয়স আঠারো-উনিশ। সশস্ত্র। যুবকটি বললো, সে ব্রিটানিতে যাচ্ছে। বীর ত্রিস্তানের খোঁজ করতে।

ত্রিস্তান মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলো, বালক, ত্রিস্তানকে তোমার কি দরকার?

–তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

ত্রিস্তান বললো, তুমি আমাকেই সে প্রয়োজনের কথা বলতে পারো। আমিই ত্রিস্তান।

যুবকটি সন্দেহের চোখে তাকালো। এমন ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, অদ্ভুত চেহারা, এই নাকি বিখ্যাত ত্রিস্তান? সে বললো, যাও, তা কখনো হয়! ত্রিস্তান তো অভিজাত রাজপুরুষ!

ত্রিস্তান বললো, আমার কেন এ চেহারা– সে অনেক গল্প। কিন্তু আমিই যে ত্রিস্তান– তাতে সন্দেহ নেই। আমার মাথা এখনো সম্পূর্ণ খারাপ হয়নি। বলো, কি তোমার প্রয়োজন?

যুবকটি কর্কশ কণ্ঠে বললো, তুমি যদি ত্রিস্তান হও, তবে যুদ্ধের জন্য তৈরী হও! তোমার সঙ্গে আমার হিসেব মেটাতে হবে!

–কিসের হিসেব?

–আমার বাবার নাম মর্গান। তিনি লিওনেস রাজ্য জয় করেছিলেন। তারপর লিওনেসের ত্রিস্তান তাঁকে খুন করে। আমি এসেছি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে।

ত্রিস্তান হেসে বললো, প্রতিশোধ! এই আমি হাত তুলছি, আমায় মারো! মর্গানের ছেলে ঘৃণায় মুখ কুঁচকে বললো, আমরা ক্ষত্রিয়, বিনা যুদ্ধে কারুকে হত্যা করি না। এসো যুদ্ধ করো।

ত্রিস্তান বিরক্তির সঙ্গে বললো, না, না, না, আমি আর যুদ্ধ করতে চাই না! ঢের যুদ্ধ করেছি। ঢের মানুষ মেরেছি। আর না, এবার আমি নিজে মরতে চাই। তোমার বাবাকে আমি মেরেছিলাম– আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। তুমি এসেছো আমাকে মেরে তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে! আবার আমার যদি কোন সন্তান থাকে–সে যাবে তোমাকে মারতে! এই কি চলবে চিরকাল? এই পর পর প্রতিশোধঃ কোনোদিন থামবে না? তোমাকে আমি বলছি, আমার কোন সন্তান নেই। তুমি আমাকে মেরে রেখে যাও। এখানেই শেষ হোক– এই প্রতিশোধের পালাবদলের! যুবক বললো, তুমি কেন আমাকে অপমান করছো? বিনা যুদ্ধে আমি মারবো না। তোমার অস্ত্র নেই, এই নাও তলোয়ার। তৈরী হও!

ত্রিস্তান ম্লান হেসে বললো, ঐখানেই তো আমার বিপদ! যুদ্ধে আমার মরণ নেই। যুদ্ধে আমি হারতে জানি না। বিশ্বাস করো আমি অহংকার করছি না, আমি আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে হারিনি, সেই আমার দোষ! তুমি আমাকে এমনি মারো!

যুবকটি ক্রুদ্ধভাবে একটি তলোয়ার তুলে দিল ত্রিস্তানের হাতে। নিজে আর একটি তলোয়ার নিয়ে দূরে সরে তৈরী হয়ে দাঁড়ালো। ত্রিস্তান তলোয়ার হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কি যেন এক গুরুভার উদাসীনতা ভর করছে তাকে। যুবকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। এ যেন তারই বালক বয়সের প্রতিমূর্তি। একে মেরে কি হবে!

যুবকটি উত্তেজিত হয়ে বার বার লড়াইয়ের জন্য ত্রিস্তানকে আহবান করতে লাগলো। তারপর আর থাকতে না পেরে নিজের তলোয়ারটা ছুঁড়ে মারলো ত্রিস্তানের দিকে। তলোয়ারটা গভীরভাবে বিদ্ধ হয়ে গেল ত্রিস্তানের দক্ষিণ বাহুতে। তীব্র স্বরে বললো, এই বুঝি এখানকার যুদ্ধের নিয়ম? এসো খোকা, তোমার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি।

বাহু থেকে নিজেই টান মেরে বার করে আনলো তলোয়ারটা। আবার ছুঁড়ে দিল ছেলেটির দিকে। রক্তে ত্রিস্তানের হাত ভেসে যাচ্ছে। বা হাতে তলোয়ার ধরে ত্রিস্তান এগিয়ে গেল ছেলেটির কাছে।

অল্পক্ষণ যুদ্ধ চললো। তার মধ্যেই ত্রিস্তান নিরস্ত্র করলো যুবকটিকে। ক্রোধ যন্ত্রণায় সে তাকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তুললো। কিন্তু মারতে গিয়েও মারলো না, ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর বললো, না থাক। বালক, তোমার বয়স কম– তোমার সামনে দীর্ঘজীবন পড়ে আছে উপভোগের আনন্দের। আমার আর মারলেই বা কি ক্ষতি। ত্রিস্তান নিজের তলোয়ারও দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

যুবকটি চেঁচিয়ে উঠলো, না, আমকে আপমান করে যেও না। আমাকে মেরে রেখে যাও।

ত্রিস্তান বললো, নাঃ। আমি আর অস্ত্র হাতে নেবো না। আমি ফিরে চলে যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে হলে– পিছন থেকে আমাকে খুন করতে পারো। এই বলে ত্রিস্তান আবার হাটতে আরম্ভ করলো। তখন যুবকটি অনুতপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, ত্রিস্তান, আমি আগেই একটা মহা অন্যায় করেছি। আমার তলোয়ারে বিষ মাখানো ছিল। মৃত্যু তোমার হবেই।

ত্রিস্তান একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে পিছনে তাকিয়ে বললো, মৃত্যু আর কি এমন বেশী কথা। মৃত্যু এখন আমার প্রাপ্য।

ত্রিস্তান যখন দুর্গে এসে পৌছুলো–তার সর্বাঙ্গ বিষে জরজর। কাহারডিন এবং সকলেই ত্রিস্তানের জন্য বিষম উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। কোথায় ত্রিস্তানের ফিরে আসার জন্য উৎসব করবে, তার বদলে হাহাকার পড়ে গেল। ত্রিস্তানের চিকিৎসার জন্য প্রাণপণে আয়োজন করতে লাগলো। রাজকুমারী রূপালি এসে সেবা করার জন্য বসলেন স্বামীর পাশে। রূপালি স্বামী সম্ভোগের সুখ পাননি, স্বামীকে সেবা করার সুখটুকু অন্তত পেতে চাইলেন। কি অদ্ভুত ধরনের স্বামী তাঁর। এমন রূপবান, গুণবান স্বামী পেয়েও তিনি সবচেয়ে দুর্ভাগিনী। রূপালি কিছুই জানেন না সোনালীর কথা।

সব চিকিৎসা ব্যর্থ হলো। এক একজন কবিরাজ, বৈদ্য এসে এক একরকম চিকিৎসা করেন। কত জড়ি–বুটি, শিকড় মন্ত্র– কিছুই কাজে লাগলো না। ক্রমশ বিষ ছড়িয়ে যেতে লাগলো ত্রিস্তানের সমস্ত শরীরে। বিছানার সঙ্গে একবারে লেগে রইল ত্রিস্তানের কঙ্কালসার দেহ। শরীরের সমস্ত হাড়গুলো গোনা যায়! এই নিয়ে তিনবার নিশ্চিত মৃত্যু এলো তার কাছে। লোকে বলে মৃত্যু কখনো তৃতীয়বার ফিরে যায় না।

শরীর দুর্বল হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও দুর্বল হতে লাগলা। বিছানায় না শুয়ে ছটফট করতে করতে সে ভাবে–সোনালীর সঙ্গে আর একবার দেখা না করে সে মরবে কি করে? এ জীবন যে সোনালীর সঙ্গে বাঁধা। সে যতই ঘৃণা করুক, অপমান করুক–সোনালীকে না জানিয়ে এ জীবন সে ছেড়ে যেতে পারে না। একদিন রাজকুমার কাহারডিন এসে ত্রিস্তানের শয্যার পাশে বসে অশ্রুপাত করছেন, তখন ত্রিস্তান বললো, তার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে। এবং সে চোখের ইশারায় রূপালিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করলো।

নারীর কৌতূহল। ত্রিস্তানের এই অবস্থাতেও কি তার গোপন কথা! রূপালি তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গোপনে ওদের কথা শুনতে লাগলেন।

ত্রিস্তান কাহারডিনকে বললো, বন্ধু তুমি জানো– আমার এ রোগ আর সারবে না। এ বিষ ছাড়াও আমার শরীরে আর এক রকম বিষ আছে, সোনালীকে না দেখলে সে বিষয়ে বলা যাবে না। তুমি একবার সোনালীর কাছে আমাকে নিয়ে চল।

–অসম্ভব ত্রিস্তান! তোমার শরীরের এই অবস্থায় তোমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না। অসম্ভব!

–তবে তুমি সোনালীকে আমার কাছে এনে দাও।

–তুমি পাগল হয়েছো ত্রিস্তান? সোনালীর সঙ্গে আমি দেখা করবো কি করে? আর দেখা করলেও তিনি আমার কথা শুনে আসবেন কেন?

ত্রিস্তান তখন সেই সবুজ পাথরের আংটিটা বার করে দিল কাহারডিনকে। বললো, তুমি বণিকের ছদ্মবেশে কোনোরকমে রাজসভায় গিয়ে যদি রানীকে এই আংটি দেখাও সে চিনতে পারবে। তা হলে তোমার কথায় নিশ্চিত আসবে সে। হ্যাঁ আসবেই। সে বলেছিল, আমার ডাক শুনলে রাজবাড়ির হাজারটা দেওয়াল ভেঙেও সে বেরিয়ে আসবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে আটকাতে পারবে না। তুমি যাও, বন্ধু! আজই যাও।

কাহারডিন নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী হলো। ত্রিস্তান তাকে আবার ডেকে বললো, যদি অনুকূল বাতাস পাও, তোমার যেতে আসতে অন্তত পনেরো দিন লাগবে। ততদিন আমি বাঁচবো কিনা জানি না। আমার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু সোনালীকে একবার দেখবার জন্য আমাকে বাঁচতে হবে। তুমি আমাকে এই দুর্গের চূড়ার সবচেয়ে উচু ঘরে শুইয়ে দাও। সেখান থেকে আমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকবো। প্রতীক্ষায় থাকবো তোমার জাহাজের। আর শোন, যখন তুমি ফিরে আসবে– তোমার জাহাজে উড়বে রাজপতাকা। আর, জাহাজে দু'রঙের পাল নিয়ে যাও। যদি সোনালী আসে, সাদা পাল উড়িয়ে

দিও। যদি সে না আসে—উড়িয়ে দিও কালো পাল। সে আসবেই। মনে রেখো—সাদা পাল আর কালো পাল। দূর থেকে তোমার জাহাজের সাদা পাল দেখতে পেলে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবো। আমি কতবার মরতে চেয়েছি। এখন আমার বাঁচতে ইচ্ছে হয়। খুব বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে। শুধু সোনালীকে ছেড়ে আমি মরতে পারি না। কাহারডিন, ভাই আমাকে বাঁচাও! আমি মরতে চাই না! আমি কাঙালের মতন বেঁচে থাকতে চাই। আমি আরও বেঁচে থাকতে চাই সোনালীর জন্যে! তুমি আজই যাও।

কাহারডিন সেই দিনই যাত্রা করলো। আর পাশের ঘর থেকে সব শুনলেন রাজকুমারী রূপালি। এই সেই রহস্য? তাঁর স্বামী অন্য নারীকে ভালোবাসে সারা জীবন! তাকে না দেখলে বাঁচবে না! আমি কেউ নই? আমি, আমি—রাজকুমারী অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। কেঁদে কেঁদে তাঁর শরীর অবশ হয়ে গেল। তাঁর সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সেই সর্বনাশিনী। ত্রিস্তান সেই রাক্ষসীর জন্যই সারা জীবন তাঁকে অপমান করলো?

কান্না শেষ হবার পর রূপালীর শরীর জ্বলতে লাগলো ক্রোধে। তিনি ছটফট করে ঘুরতে লাগলেন সারা দুর্গে। কোথাও তিনি একমুহূর্ত দাঁড়াতে পারেন না, বসতে পারেন না। বাতাসের স্পর্শেও যেন তাঁর গায়ে ছ্যাঁকা লাগছে। স্বামীর অবহেলায় এতদিন তিনি ছিলেন বিষন্ন, আজ স্বামীর মুখে অন্য নারীর নাম শুনে এক মুহূর্তে তাঁর সারা শরীর অস্থির।

দুর্গের এ কোণ থেকে ও কোণ ঘুরছেন রূপালী। এক সময় তাঁর চোখ পড়লো, দুর্গের দরজার কাছে দাঁড়ানো শৃঙ্খলিত রিওলের দিকে। ত্রিস্তান ওর জীবন ভিক্ষা দেবার পর, রাজকুমার কাহারডিন দুর্গের সিংহদ্বারে ওকে শিকলে হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রিওয়লের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রূপালী ভাবলেন, এর চেয়ে তাঁর যদি ঐ পশুর মতো কুৎসিৎ রিওলের সঙ্গে বিয়ে হতো, তা বোধহয় ছিল ভালো। তবু তো ও একটা পুরুষ। এবং ও রূপালীকেই পাবার জন্য যুদ্ধে নেমেছিল। আর বীর ত্রিস্তান, যে তাঁর উদ্ধারকারী, সে তাঁকে ছুঁয়েও দেখলে না! রূপালি একা একা কাঁদতে লাগলেন।

রূপালি ত্রিস্তানকে সত্যি ভালোবাসতেন অন্তর দিয়ে। পূজারিনী যেমন মন্দিরের দেবতাকে ভালোবাসে। যদিও তাঁর ভালোবাসা এক দিনের জন্যেও চরিতার্থ হয়নি। আজ যেন সেই দেবতার মূর্তির মধ্যে খড় কাদা—মাটি দেখতে পেলেন। মৃত্যুকালেও স্বামী চেয়ে আছেন অন্য নারীর পথের আশায়! পাশে নিজের বিবাহিতা স্ত্রী অথচ গ্রাহ্য নেই। রূপালি ভাবলেন, তিনি দারুণ প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু কি সেই প্রতিশোধ?

মেয়েদের রাগ আর মেয়েদের ভালোবাসা— কোনটা বেশী প্রবল তা বলা মুশকিল। কোমল, রূপশ্রীময়ী রূপালি এত অপমান সত্ত্বেও ত্রিস্তানকে স্বার্থহীনভাবে ভালোবাসতেন। আর এখন প্রতিশোধের চিন্তায় জ্বলতে লাগলেন।

এদিকে ত্রিস্তান জানালার সামনে বসে থাকে দিন রাত। দিনের পর দিন যায়, ক্রমে পনেরোদিন পার হয়ে গেল। জাহাজের দেখা নেই। ত্রিস্তানের আর বসে থাকারও ক্ষমতা নেই। বিছানায় মরার মতো পড়ে থাকে। সেখান থেকে সমুদ্র ভালো দেখা যায় না। বারবার রূপালিকে ডেকে বলে, দেখো তো, রাজকুমারে জাহাজ আসছে কিনা! তবে সে কি আসবে না।

একদিন দূরে সত্যিই দেখা গেল জাহাজ। উপরে পতপত করছে পতাকা। ত্রিস্তানের তখন চোখে দেখারও সাধ্য নেই। চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারে না। জানলার কাছ থেকে সরে এসে রূপালী বললো, জাহাজ আসছে, রাজকুমারের জাহজ। ত্রিস্তান তোমার জন্য দাদা ওষুধ আনছেন, নিয়ে আসছেন এক মায়াবিনীকে!

জাহাজ? ত্রিস্তান অসহায় চোখে তাকালেন রাজকুমারীর দিকে। তারপর করুণভাবে ভিক্ষে-চাওয়ার মতো বললো, রাজকুমারী, দয়া করে বলো, সে জাহাজে কি রঙের পাল? সাদা নিশ্চয়ই।

রাজকুমারীর ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগলো, তিনি কথা বলতে পারলেন না। ত্রিস্তান নিদারুণ অনুয়ের সাথে বললো, রূপালি একবার দেখো, কি রঙের পাল? আমার দেখার সাধ্য নেই যে!

জানলার ধারে সরে গিয়ে রাজকুমারী একবার তাকালেন সেই সাদা পালের জাহাজের দিকে। তারপর ক্ষিপ্তের মতো তীব্রকণ্ঠে বললেন, কালো, কালো। ভয়ঙ্কর কুৎসিত, বীভৎস রঙের কালো।

--কালো? না না তা হয় না, রূপালি তুমি আর একবার দেখো।

--আমি বলছি কালো। ঝড়ের মেঘের মত কালো। সর্বনাশের মতো কালো পাল তুলে আসছে জাহাজ

–রূপালি, তোমার দয়ার প্রাণ। তুমি সত্যি কথা বলো। আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি! কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। যদি তুমি মিথ্যে কথা বলো, আর এক মুহূর্তও আমার বাঁচার সামর্থ্য নেই। তুমি বিধবা হবে। আর একবার দেখে বলো, জাহাজ কোন্ রঙের পাল উড়িয়ে আসছে?

রূপালী কঠিন মুখে বললেন, কালো!

–কালো? হঠাৎ ত্রিস্তানের চোখ ঘুর্ণিত হতে লাগলো। বুকরে খাঁচাটা প্রবলভাবে উঠা–নামা করতে লাগলো নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায়।

তা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন রূপালী , না, না, না, আমি দেখেছি সাদা! মেঘ কেটে, আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সাদা রঙের পাল। জাহাজ এসে বন্দরে লেগেছে!

ত্রিস্তান ক্ষীণভাবে বললো, তাহলে সোনালী এসেছে?

–হ্যাঁ, সে এসেছে। আমি নিজে তাকে নিয়ে আসছি। রূপালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কত দূরে যাবেন। যদি এর মধ্যেই ত্রিস্তান মরে যায় –একা ঘরে, অসহায়? দরজার পাশে একটু দাঁড়িয়ে থেকে রূপালি আবার এসে ঘরে ঢুকলেন।

শব্দ শুনে ত্রিস্তান বললো, কে? সোনালী?

ধরা গলায় রূপালী বললেন, হ্যাঁ ত্রিস্তান আমি এসেছি।

–সোনালী! আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

রূপালি আবার বললেন, ভয় নেই ত্রিস্তান, আমি এসেছি।

–সোনালী, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। তুমি আমার বুকের কাছে এসো। তুমি মুছে নাও আমার শরীরের বিষ। সোনালী, আমার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে! এসো!

রূপালি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রিস্তানের বুকে। এই প্রথম তাঁর স্বামীস্পর্শ। কিন্তু, মুহূর্তে মৃগীরোগীর মতো এক ঝটকায় তাকে দূরে ঠেলে দিল ত্রিস্তান। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, চোর! পাপিষ্ঠ! এ সোনালী নয়! সোনালীর স্পর্শ আমি চিনি। তার স্পর্শ আমার সারা শরীরে লেগে আছে। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার একটি আঙুলের স্পর্শ আমি চিনতে পারবো!

একটু দম নিয়ে ত্রিস্তান আবার বললো, রূপালি, কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ, তোমার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু জীবনের শেষ সময়টুকুতে আমায় দয়া করে শান্তি দাও! তুমি সত্য করে বলো, সোনালী এসেছে কিনা!

মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন রূপালি। সেখান থেকে ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ছায়াটি গেলেন জানালার পাশে। সেখান থেকে শান্ত স্বরে বললো, ত্রিস্তান, সে আসবে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার দাদার জাহাজে শোকের চিহ্ন। শুধু কালো রং। কালো পতাকা কালো পাল।

–কালো। ত্রিস্তান জোরে নিঃশ্বাস ফেললো একবার। তারপর যেন মন্ত্রবলে শক্তি পেয়ে উঠে বসলো বিছানার ওপর সোজা হয়ে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিন বার ডাকলো–সোনালী–সোনালী–সোনালী। সেই ডাক যেন ছিন্নভিন্ন করে দিল বাতাস। সেই করুণ ডাকে যেন কালো মেঘ ফুঁড়ে চলে গেল স্বর্গের দিকে। ত্রিস্তান প্রাণপণে চেষ্টা করলো পাখির মতো শিষ দিয়ে উঠতে। গলা ভেঙে গেল, পারলো না। ধপ্ করে ত্রিস্তান পড়ে গেল বিছানায়।

রাজকুমারের জাহাজ যখন লাগলো–তখন সমস্ত দুর্গে কান্নার রোল। জাহাজ থেকে প্রায় ঝাঁপিয়ে নেমে এলো এক নারী। তার রুক্ষ সোনালী চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, ছুটে চললো দুর্গের দিকে। পথের লোকেরা অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগলো, কে এই দেবী–মূর্তির চেহারায় উন্মাদিনী নারী? সেই নারী তখন যাকে সামনে পাচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে, ত্রিস্তান কোথায়? ত্রিস্তান কোথায়? এই রকম প্রশ্ন করতে করতে উঠে এলো দুর্গের উচ্চতর ঘরে। সেখানে ত্রিস্তানের বুকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে রূপালি। রানী সোনালী সেখানে এসে শান্তভাবে বললেন বোন, তুমি একটু সরে যাও। আমাকে একবার কাঁদতে দাও। বিশ্বাস করো, ওর চেয়ে আপনজন–আমার এ বিশ্বসংসারে কেউ ছিল না।

সোনালী উঠে এলো ত্রিস্তানের খাটে। ত্রিস্তানকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে ওর মরা ওষ্ঠে চুম্বন করতে করতে বললেন, ত্রিস্তান, আমি রাজবাড়ির দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসেছি। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো সেই দেশে। আমি একা থাকবো না।

সেই ভাবেই সোনালীর মৃত্যু হলো। ত্রিস্তানকে আলিঙ্গন করে।

রাজা মার্কের কানে যখন ওদের দুজনেরই মৃত্যু সংবাদ পৌছুলো, তিনি নিজে এসে দুটি বহুমূল্য শবাধারে ওদের দুজনের দেহ সাজিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের দেশে, তারপর একটি নির্জন গির্জার দু'পাশে ওদের দুজনকে কবর দিলেন। সেই দিন থেকে তিনি সত্যিকারে বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেল। রাজা মার্কের এতদিনেও সন্তান হয়নি, ত্রিস্তানকে হারিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্তান হলেন।

কয়েকমাস বাদে ত্রিস্তানের কবর থেকে একটা অদ্ভুত লতানো গাছ বেরিয়ে আসে। তীব্র গন্ধময় তার ফুল। সেই গাছটা গির্জার ছাদ পেরিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওপাশের সোনালীর কবরে। তিন তিনবার কবরের রক্ষকরা সেই গাছ কেটে দিল। তিনবারই আবার গজিয়ে উঠলো সেই গাছ। রক্ষকরা তখন গিয়ে সেই অলৌকিক ঘটনা রাজাকে জানাতে, রাজা নিজে এসে সেই গাছ দেখলেন। তারপর ওদের নিষেধ করলেন আর সেই গাছ কাটতে। তখন ক্রমে সেই গাছটা দিনে দিনে লক্ লক্ করে বেড়ে উঠে গির্জার ছাদ পেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়লো সোনালীর কবরে। সেখানে ওর ফুল ফুটে উঠলো অজস্র।

প্রভুগণ, যুগ যুগ ধরে কবিরা এই গান শুনিয়েছে! ত্রিস্তান আর সোনালীর ভালোবাসা আর দুঃখের গান। আমি সামান্য কবি–একদা পূর্ববঙ্গবাসী অধুনা ভ্রাম্যমান–গঙ্গোপাধ্যায় বংশী সুনীল আমার নাম। যদিও ব্রহ্মকুলে জন্ম, কিন্তু জ্ঞানের বদলে ভালোবাসার শক্তিতেই আমার বেশী বিশ্বাস তাই ভালোবাসার এই অমর গাথা আমি শোনাতে চেয়েছি। আমার

বাক্‌শক্তি সীমিত, আমার ভাষাজ্ঞান সীমিত, আমি জানি না শব্দের ঝংকার, জানি না বর্ণনার ছটা। আপনারা গুনীজন, আপনারা বহুদর্শী, রসজ্ঞ সহৃদয়-আপনাদের সভায় ভরসা করে এ গান শোনালাম। এ গান শুনলে, যে দুর্বল সে আবার শক্তি ফিরে পায়। ভালোবাসায় যার অবিশ্বাস এসেছে, সে আবার ভালোবাসায় বেঁচে ওঠে। যার জীবনে কখনো ভালোবাসা জাগেনি, এ গান শুনলে সেই পাথরে বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে ঝরনা। এই ভালোবাসার গান শুনলে মানুষ মরতে ভয় পায় না। ভালোবাসা ছাড়া জীবন হয় না, যেমন দুঃখ ছাড়া ভালোবাসা হয় না। ভালোবাসার জাত নেই, গোত্র নেই, ধর্ম নেই।

ত্রিস্তান আর সোনালী যদি আবার জন্মায়, জানি ওরা পরস্পরকে আবার ঠিক এই রকম ভালোবাসতে চাইবে-এক জীবনের শত সহস্র দুঃখের কথা জেনেও। কি জানি, হয়তো ওরা আবার জন্মেছে, সব বিপদ তুচ্ছ করেও আবার ভালোবেসেছে। আপনারা ওদের আশীর্বাদ করুন।

## পশ্চাৎভূমিকা

ত্রিস্তান ও সোনালীর কাহিনী, পশ্চিম জগতের একটি প্রখ্যাত প্রেমের কাহিনী। অনেকের মতে, ভালোবাসার প্রগাঢ়তায় ও বৈচিত্রে এই কাহিনীটি এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ। মধ্যযুগে আমাদের দেশে যখন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনীর সূত্রপাত, সেই সময়ে, পৃথিবীর অপর খণ্ডেও এক ধরনের প্রেমের বর্ণাঢ্য রচনা শুরু হয়- যাকে বলা হয় 'কোর্টলি লাভ'-সেই সব উপাখ্যানেরও নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক নেই-অবৈধ, পরকীয়া প্রেম। নায়ক অনেক সময়ই নায়িকার অন্য সূত্রে আত্মীয়। এইসব প্রেমকাহিনীর নায়ক উদার, একনিষ্ঠ, বিপদ তুচ্ছ করা। ত্রিস্তানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় নবম শতাব্দীর কিছু আইরিশ উপাখ্যানে- যেখানে সে নির্ভীক নাইট, অনায়াসে ড্রাগন হত্যা করেছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফরাসী কবিরা ত্রিস্তানকে উপস্থিত করেন মহৎ প্রেমিক হিসেবে -অসংখ্য কাব্যগাথায় ত্রিস্তানের প্রেমের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। রাজা আর্থারের বিখ্যাত গোলটেবিলে নাইটদের সঙ্গেও ত্রিস্তানের নাম যুক্ত দেখা যায় (আমি ত্রিস্তানের সে-পরিচয় গ্রহণ করিনি।) কবিদের গানে গানে ত্রিস্তানের কাহিনী ভ্রমণ করে সারা ইউরোপ, বহু ভাষায় গায়করা এই গান শুনিয়ে রাজসভার মনোরঞ্জন করতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সব কবিদের মূল সম্পূর্ণ রচনা এখন আর পাওয়া যায় না। নানা কবির মুখে রূপান্তরিত হতে হতে ত্রিস্তানের কাহিনী ক্রমশঃ সম্পূর্তা পায়, শুধু দুঃসাহিসিকতা এবং অবৈধ প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিস্তানের চরিত্রে যুক্ত হয় মানসিক দ্বন্দ্ব, দুঃখবোধ, নির্জনতা। জার্মানীর গটফ্রিড ভন স্টারবুর্গ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ত্রিস্তানের উপাখ্যানের একটি বিশাল রূপ দিয়েছিলেন, যদিও তার রচনাও অসমাপ্ত। ক্রমশঃ কোর্টলি লাভে'র ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ত্রিস্তানের আখ্যান হয়ে উঠে নিজ বৈশিষ্টে স্বতন্ত্র, ত্রিস্তানকে মনে হয় সকল নায়কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে একই সঙ্গে বীর যোদ্ধা এবং বীনাবাদক, দক্ষ নাবিক, পাখির মতো শিষ দিতে পারে, নিজের রাজ্য ছেড়ে আসে অনায়াসে, ভিখারী সেজে থাকে- এত বিচিত্র গুণাবলী আর কোন নায়কের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

আধুনিককালে ত্রিস্তানের কাহিনী অসংখ্য কবি ও শিল্পী কাব্যে, মঞ্চে, ছায়াচিত্রে, গানে রূপ দিয়েছেন। ভাগনারের গীতিনাট্য পৃথিবী বিখ্যাত। ইংরেজ কবিদের মধ্যে টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড, সুইনবার্ন, টমাস হার্ডি, মেসফিল্ড প্রভৃতি ত্রিস্তানের কাহিনী অবলম্বন করেছেন। ফরাসী পণ্ডিত জোসেফ বেদিয়ে বহু প্রাচীন আখ্যানে সমন্ব করে এ–কাহিনীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ করেছিলেন, হিলোয়ার বেলক–কৃত তার ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায়। সেই বই পড়েই আমি প্রথম আকৃষ্ট হই।

আমার এ–রচনা কোনো বিশেষ কবির ভাষ্যের অনুবাদ নয়। প্রথম ত্রিস্তানের কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়ে আমি অন্যান্য কবিদের রূপান্তর পড়তে শুরু করি। তারপর আমার শখ হয়, ত্রিস্তানের কাহিনীর একটি নিজস্ব ভাষ্য প্রস্তুত করার। প্রবাসের অলস দিনগুলিতে আমি নিজের খেয়াল অনুযায়ী গল্পটা লিখতে শুরু করেছিলাম। এ কারণে, আমি বহু খণ্ড–আখ্যান বর্জন করেছি, কিছু অধ্যায় নিজে রচনা করেছি। আমার ধারণা, প্রেমিকের মনে উদাসীনতা না এলে তার শারীরিক মৃত্যুও আসে না– কাহিনীর শেষ দিকে ত্রিস্তানের চরিত্রে সেই উদাসিনতা আমার যোগ। অধিকাংশ ভাষ্যেই উন্মাদ ত্রিস্তানকে শেষ পর্যন্ত সোনালী চিনতে পেরেছিল, শেষবার মিলন হয়েছিল ওদের, কিন্তু আমি আর ওদের মিলতে দিইনি, একটু বেশী নিষ্ঠুরতা হলো হয়তো। বাজীকরের পুতুল খেলা কিংবা শেষ পরিচ্ছেদে যুবকের সঙ্গে ত্রিস্তানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইত্যাদি কয়েকটি দৃশ্য, সম্পূর্ণ আমার কল্পনা। ত্রিস্তান কাহিনীর সবচেয়ে বিতর্কমূলক অংশ, জাহাজে মায়া–আরক পান করার দৃশ্য। ওখানে বস্তুতঃ এই প্রণয়গাথার প্রাচীন সৌরভ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আমি আমার ভাষা বর্ণনাভঙ্গি যতদূর সম্ভব প্রাণপণে সরল করতে চেয়েছি। চেয়েছি, ত্রিস্তানের এই প্রেমের কাহিনী আমার মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো আধুনিক প্রেমের কাহিনী যেন না হয়ে ওঠে কোনোক্রমে।

পাত্র–পাত্রীদের নাম আমি ইচ্ছে মতো বদলেছি, অধিকাংশ সময়ই ধ্বনি সাদৃশ্যে কিংবা বাংলা অর্থ অনুযায়ী। ওদেশেও এই বদল হয়েছে অনেক। ইংরেজ কবিরা অনেকেই ত্রিস্তানকে 'টিসস্ট্রাম' লেখেন। রানী সোনালী, যার আসল নাম ইসল্ট বলেছি আমি, তাঁর নাম Iselut, Isolde, Isoud, Yseult পর্যন্ত দেখেছি।

রাধা ছিলেন কৃষ্ণের মামীমা, সোনালী ও ত্রিস্তানের তাই। মুমূর্ষু ত্রিস্তানকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া– যেন লখীন্দরের কথা মনে পড়ে যদিও সঙ্গে বেহুলা নেই, এবং ত্রিস্তান সম্পূর্ণ মরেনি– তুব কেন যেন মনে পড়ে। সোনালীর সতীত্বের পরীক্ষার সঙ্গে সীতার অগ্নিপরীক্ষার স্পষ্ট মিল–যদিও ওদেশে সতীত্বের আদর্শ ভিন্নপ্রকার। নারী ও পুরুষের মাঝখানে উন্মুক্ত তরবারি রেখে শোওয়া যে পবিত্র সম্পর্কের প্রতীক এ ধারণা আমাদের দেশে রাজস্থান অঞ্চলের প্রচলিত। কিন্তু থাক্। ত্রিস্তানের কাহিনী পড়া শেষ করার পর– এসব নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা হয়তো প্রগলভতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়